ওঁ

দেবী পূজার সত্যতা কি ?

অনন্ত শ্রী বিভূষিত
পূজ্য স্বামী শ্রী পরমানন্দ জী
মহারাজ (পরমহংস জী)

স্বামী শ্রী অড়গড়ানন্দজী মহারাজ

পাছে লাগা জায় থা, লোক বেদ কে সাথ।
মারগ মে সদ্গুরু মিলা, দীপক দীন্হা হাথ।।

আমাদের প্রকাশনা

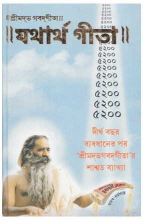

যথার্থ গীতা -
'যথার্থ গীতা'তে
শ্রীকৃষ্ণের বাণীর আশয়
উত্তমরূপে যথাবৎ বুঝিয়েছেন
এই কৃতি কালজয়ী।

২৮টি ভাষাতে

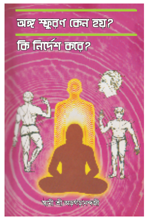

অঙ্গ স্ফুরণ কেন হয় এবং কি নির্দেশ করে? -
মানব দেহের বিভিন্ন অঙ্গে যে স্ফুরণ হয় এর কারণ
এবং এর সঙ্কেতগুলি বিশ্লেষণ করা হয়েছে।
যা সাধনাতে সহায়কের কাজ করে।

৪টি ভাষাতে

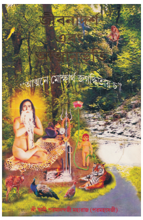

জীবনাদর্শ এবং আত্মানুভূতি -
পূজ্য গুরু পরমহংস
স্বামী শ্রী পরমানন্দজী মহারাজ-এঁর
জীবনের বৃত্তান্ত, তাঁর অনুভূতি
এবং উপদেশ সঙ্কলিত করা হয়েছে।
সাধকদের জন্য এই গ্রন্থ খুবই প্রয়োজনীয়।

৪টি ভাষাতে

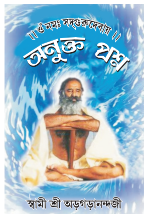

অনুক্ত প্রশ্ন -
বর্ণ, মূর্তিপূজা, ধ্যান, হঠ, চক্র-ভেদন এবং
যোগ-এর মত বিষয়গুলি স্পষ্ট করে ভ্রমিত
সমাজের পথ প্রদর্শন করা হয়েছে।

৩টি ভাষাতে

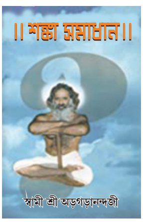

শঙ্কা সমাধান -
সমাজে প্রচলিত কুরীতি,
আড়ম্বর এবং অন্ধবিশ্বাসের
নিবারণ এবং সমাধান
করা হয়েছে।

৫টি ভাষাতে

একলব্যের অঙ্গুষ্ঠ -
শিক্ষা-গুরু এবং সদ্গুরুর মধ্যে পার্থক্য বলা হয়েছে।
শিক্ষকেরা জীবন নির্বাহ করার কৌশল-এর শিক্ষা দেন।
পরন্তু সদ্গুরু জীবনে পরমশ্বের-এর জাগৃতি এবং
পরমপদ লাভ করতে সাহায্য করেন যার ফলে পুরুষ
গমনাগমন থেকে মুক্ত হন।

৩টি ভাষাতে

কার ভজনা করব? -
জনসাধারণ ধর্মের নামে গরু,
অশ্বত্থ, দেব-দেবী, ভূত-
ভবানীর পূজা করে। প্রস্তুত পুস্তিকাতে
এই সকল ভ্রান্তির নিবারণ করে
স্পষ্ট করা হয়েছে যে, সনাতন
ধর্ম কাকে বলে? ইষ্ট কে?

৬টি ভাষাতে

ষোড়শোপচার পূজন পদ্ধতি -
একমাত্র পরমাত্মাতে শ্রদ্ধা স্থির করা এবং
একমাত্র পরমাত্মাকে চিন্তন করার
পদ্ধতি সম্বন্ধে কর্মকাণ্ড অবগত করায়,
এই পুস্তিকাতে এই সম্বন্ধেই বলা হয়েছে।

৩টি ভাষাতে

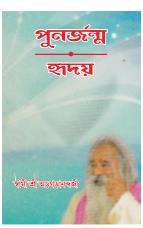

হিন্দী ভাষাতে

পুনর্জন্ম -
বৌদ্ধিক স্তরে এই বিষয়টি সকলের কাছে স্পষ্ট নয়।
মানুষ জন্মগ্রহণ করে, জীবনযাপন করে; দেহত্যাগ করে,
চলেও যায়; কিছু বুঝতেই পারে না যে, পুনরায় জন্ম হয় অথবা
হয় না। কিন্তু যোগাভ্যাসের এক নির্দিষ্ট স্তর যখন মানুষ অতিক্রম
করে তখন সে স্পষ্ট দেখে যে পুনর্জন্ম হয়? আমি পূর্বজন্মে
কি ছিলাম? এরপর কোন দেহ, কোথায় জন্মগ্রহণ করব?

হৃদয়

হৃদয় দেহের কোন অংশে স্থিত যেখানে পরমাত্মার নিবাস?
হৃদয়ের পরিচয় এবং পরমাত্মাকে জানার সম্পূর্ণ বিধির উপর
আলোকপাত করা হয়েছে। ক্রমোন্নত দেহ তিনটি স্থূল, সূক্ষ্ম এবং
কারণ। ক্রমশঃ কারণ শরীরের অন্তিম স্তরে যখন সাধনা পৌঁছায়,
তখন ঈশ্বরের নিবাসস্থান সম্বন্ধে জানা যায়। এই পুস্তিকা এইসমস্ত
প্রশ্নেরই পূর্ণ পরিচয় দেয়।

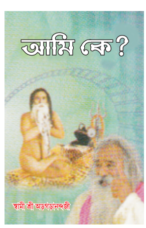

হিন্দী ভাষাতে

আমি কে? -
জন্ম থেকেই নানা প্রকারের সম্বন্ধের মাঝে থেকে এই
ভ্রম উৎপন্ন হয় যে, আমি কে? এই জিজ্ঞাসা যৌগিক।
'বাসাংসি জীর্ণানি...' দেহ বস্ত্র মাত্র। দেহ ত্যাগ হলে সেই
ব্যক্তি পশু, কীট-পতঙ্গ ইত্যাদি অধম যোনিতে জন্মগ্রহণ
করে। মৃত্যুকালে রাজসিকগুণ কার্যরত থাকলে সেই ব্যক্তি
মনুষ্যদেহ লাভ করে। সাত্ত্বিক গুণের কার্যকালে দেহত্যাগ
করলে দেব দেহ ইত্যাদি উন্নত যোনিতে জন্ম হয়। প্রত্যেক
অবস্থাতে স্থিত ব্যক্তিকে জন্মগ্রহণ করতে হয়। অতএব
এই প্রশ্ন যেমনের তেমনি রইল যে, আমি কে? বাস্তবে
যখন দ্রষ্টা এই আত্মা স্বীয় স্বরূপে স্থির হয়, যা আপনার
বাস্তবিক স্বরূপ।

।। ওঁ নমঃ সদ্‌গুরুদেবায় ।।

দেবী-পূজার সত্যতা কি?

লেখক ঃ

পরমপূজ্য শ্রী পরমহংস মহারাজের কৃপা-প্রসাদ

স্বামী শ্রী অড়গড়ানন্দজী

শ্রী পরমহংস আশ্রম

গ্রাম - পত্রালয় - শক্তেষগড়, জেলা - মির্জাপুর, উ.প্র., ভারত

প্রকাশক ঃ

শ্রী পরমহংস স্বামী অড়গড়ানন্দজী আশ্রম ট্রাস্ট

ন্যু অপোলো ইস্টেট, গালা নং - ৫, মোগরা লেন (রেলওয়ে সাবওয়ের নিকট)

অন্ধেরী (পূর্ব), মুম্বাই - ৪০০০৬৯, ভারত

প্রকাশক ঃ
শ্রী পরমহংস স্বামী অড়গড়ানন্দজী আশ্রম ট্রাস্ট
ন্যু অপোলো স্টেট, গালা নং-৫,
মোগরা লেন (রেলওয়ে সাবওয়ের নিকট)
অন্ধেরী (পূর্ব), মুম্বাই - ৪০০ ০৬৯, ভারত
ই-মেল ঃ contact@yatharthgeeta.com
ওয়েবসাইট ঃ www.yatharthgeeta.com

@ লেখক

সংস্করণ - প্রথম, মে ২০১৬ খৃষ্টাব্দ - ৫,০০০ সংখ্যক
দ্বিতীয়, জুন, ২০১৬ খৃষ্টাব্দ - ১০,০০০ সংখ্যক

মূল্য ঃ ৪০ টাকা মাত্র

মুদ্রক ঃ
জক প্রিন্টার্স প্রাঃ লিঃ
জক কম্পাউন্ড, দাদোজী কোন্ডদেব ক্রস লেন
ভায়খলা (পূর্ব), মুম্বাই - ৪০০ ০২৭, ভারত
ফোন নং ঃ (০০৯১-২২) ২৩৭৭ ২২২২
ওয়েবসাইট ঃ www.jakprinters.com

অনন্তশ্রী বিভূষিত
যোগিরাজ, যুগ পিতামহ

পরমপূজ্য শ্রী স্বামী পরমানন্দজী
শ্রী পরমহংস আশ্রম অনুসুইয়া-চিত্রকূট
এঁর পরম পবিত্র চরণ যুগলে
সাদরে সমর্পিত
অন্তঃ প্রেরণা

গুরু বন্দনা

।। ওঁ শ্রী সদ্‌গুরুদেব ভগবানের জয় ।।

জয় সদ্‌গুরুদেবং পরমানন্দং, অমর শরীরং অবিকারী।।
নির্গুণ নির্মূলং, 'ধরি স্থূলং', কাটন শূলং ভবভারী।।

সূরত নিজ সোহং, কলিমল খোহং, জনমন মোহন ছবিভারী।।
অমরাপুর বাসী, সব সুখ রাশী, সদা একরস নির্বিকারী।।

অনুভব গম্ভীরা, মতি কে ধীরা, অলখ ফকীরা অবতারী।।
যোগী অদ্বৈষ্টা, ত্রিকাল দ্রষ্টা, কেবল পদ আনন্দকারী।।

চিত্রকূটহিঁ আয়ো, অদ্বৈত লখায়ো, অনুসুইয়া আসনমারী।।
শ্রীপরমহংস স্বামী, অন্তর্যামী, হ্যাঁয় বড়নামী সংসারী।।

হংসন হিতকারী, জগ পগুধারী গর্ব প্রহারী উপকারী।।
সৎ-পন্থ চলায়ো, ভরম মিটায়ো, রূপ লখায়ো করতারী।।

ইয়হ্ শিষ্য হে তেরো, করত নিহোরো, মোপন হেরো প্রণধারী।।

জয় সদ্‌গুরুদেবং পরমানন্দং, অমর শরীরং অবিকারী।।
নির্গুণ নির্মূলং, 'ধরি স্থূলং', কাটন শূলং ভবভারী।।

‘‘আত্মনে মোক্ষার্থ জগদ্ধিতায় চ’’

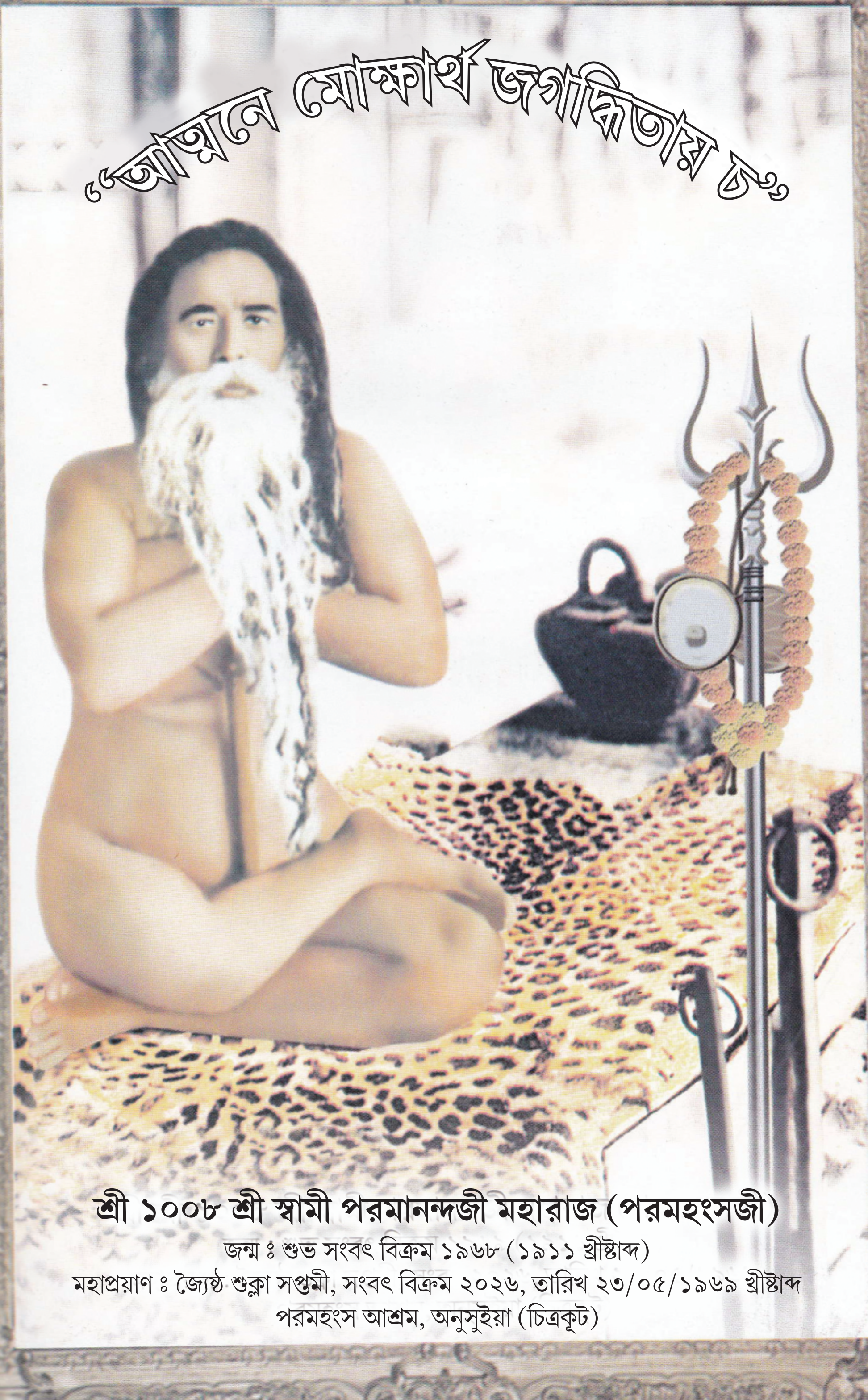

শ্রী ১০০৮ শ্রী স্বামী পরমানন্দজী মহারাজ (পরমহংসজী)

জন্ম ঃ শুভ সংবৎ বিক্রম ১৯৬৮ (১৯১১ খ্রীষ্টাব্দ)

মহাপ্রয়াণ ঃ জ্যৈষ্ঠ শুক্লা সপ্তমী, সংবৎ বিক্রম ২০২৬, তারিখ ২৩/০৫/১৯৬৯ খ্রীষ্টাব্দ

পরমহংস আশ্রম, অনুসুইয়া (চিত্রকূট)

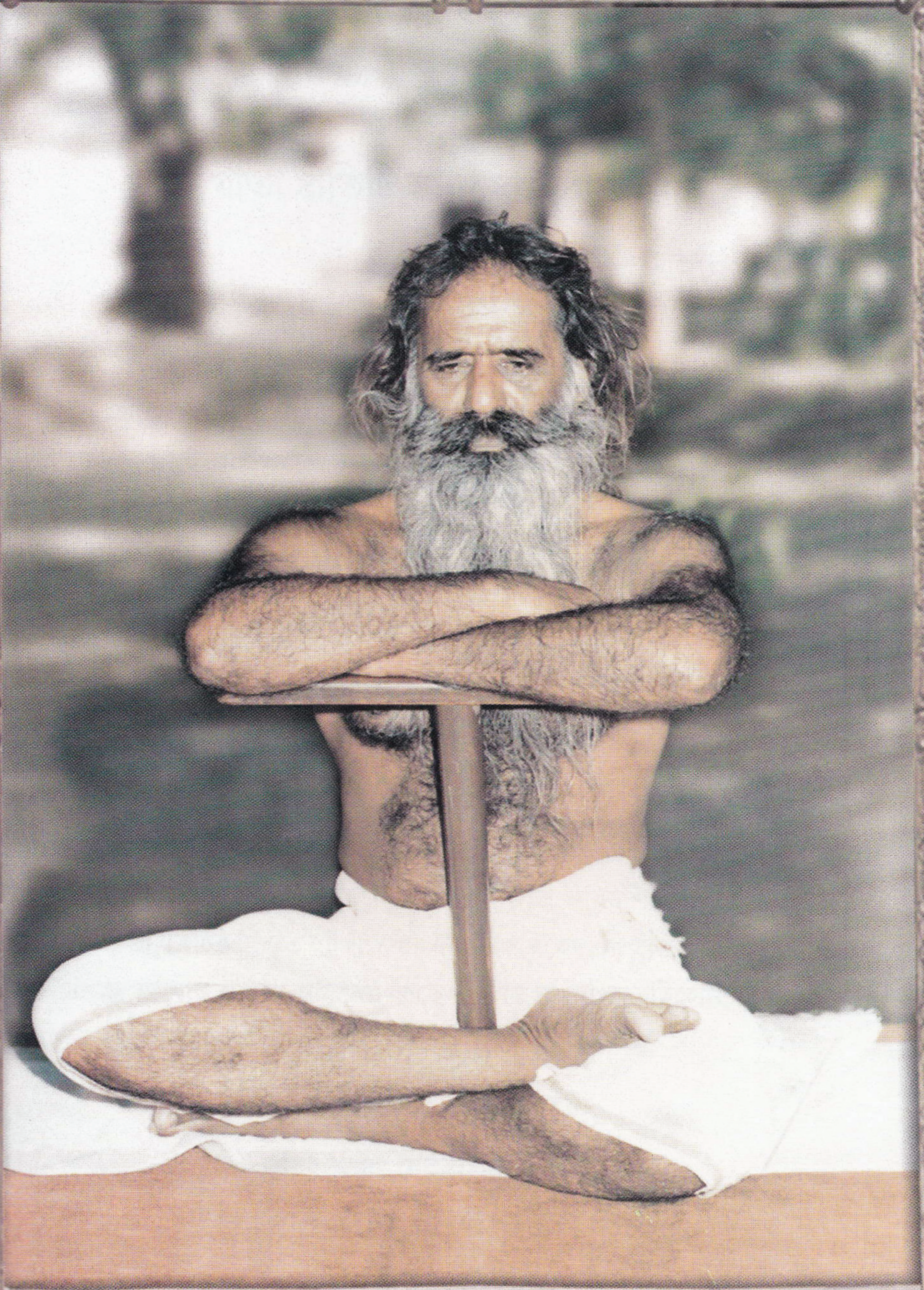

স্বামী শ্রী অড়গড়ানন্দজী মহারাজ

(পরমপূজ্য শ্রী পরমহংসজী মহারাজের কৃপা প্রসাদ)

দেবী-পূজার সত্যতা কি?

শ্রী পরমহংস আশ্রম শক্তেষগড়, মির্জাপুরের নিয়মিত ভক্তগণ নিবেদন করেছিলেন যে, মহারাজ! আপনি উপদেশে বলেন যে, গীতার অনুসারে ব্রহ্মা থেকে শুরু করে যাবন্মাত্র জগৎ, দিতি-অদিতির সন্তানগণ দেব-দেবী, দানব এবং মানব সকলেই নাশবান ক্ষণভঙ্গুর, দুঃখের খনি এবং জন্ম-মৃত্যুর চক্রে আবর্তন করছে, এর থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য একমাত্র পরমাত্মার ভজনা করা উচিত। তবে ভারতবর্ষে অসংখ্য দেবদেবীর পূজা কেন প্রচলিত? অন্য একজন ভক্ত প্রশ্ন করেছিলেন স্বামী রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবও কালীপূজা করতেন। অন্য আর এক ভক্ত প্রশ্ন করেছিলেন - বর্তমানে দুর্গাপূজা লোকপ্রিয় হচ্ছে, এর মাহাত্যের উপর আলোকপাত করুন। ভক্তদের জিজ্ঞাসাতে জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী ২০১৫ খ্রীষ্টাব্দে মহারাজজী দৈনিক প্রবচনে এই বিষয়ে যা বলেছেন তা নিম্নে প্রস্তুত করা হয়েছে।

দেখুন, বিশ্বের সকল মহাপুরুষ আদিশাস্ত্র গীতাশাস্ত্রেরই সংবাদবাহক। সকলের এক উপদেশ - সংসারে একজনই ভগবান এবং তাঁকে লাভ করার বিধিও একটাই রয়েছে। যে চিত্ত প্রকৃতিতে মুগ্ধ, সেখান থেকে একে বলপূর্বক আকর্ষণ করে পরমাত্মাতে নিযুক্ত করুন। অন্য কোন বিধি নেই। সংসারে যেখানে - যেখানে মন আবদ্ধ, সেখান সেখান থেকে সরিয়ে পরমাত্মাতে নিযুক্ত করার চেষ্টা করুন। মন নিযুক্ত করার কিছু - কিছু নিয়ম আছে সেগুলি পালন করতে হয় যেমন - শৌচ অর্থাৎ কায়মনোবাক্যে পবিত্রতা, সন্তোষ, তপস্যা, স্বাধ্যায়, ঈশ্বর-প্রণিধান ইত্যাদি, এ সম্বন্ধে গীতাশাস্ত্রে ক্রমান্বয়ে বলা হয়েছে। ভগবান বলেছেন -

যে তু ধর্ম্যামৃতমিদং যথোক্তং পর্যুপাসতে।
শ্রদ্দধানা মৎপরমা ভক্তাস্তেহতীব মে প্রিয়াঃ।। (গীতা, ১২/২০)

অর্জুন! যে সকল মৎপরায়ণ আন্তরিক শ্রদ্ধাযুক্ত পুরুষ উপর্যুক্ত ধর্মময় অমৃতের উত্তমরূপে সেবন করেন, সেই সকল ভক্ত আমার অত্যন্ত প্রিয়। তারা ভক্তদের মধ্যে অতি উত্তম ভক্ত এই আমার অভিমত। এই প্রকার সম্পূর্ণ গীতাশাস্ত্র ধর্মময় অমৃত।

ধর্ম কি? ধর্মপথ সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ, বিভিন্ন দেব-দেবীর ভজনা করেন। এই সমস্ত ক্রিয়া সাধনাপথে প্রবেশের চেষ্টা, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বিভিন্ন শ্রেণী সমূহ। শ্রদ্ধা জাগানোর জন্য কিছু কাল পর্যন্ত এই সমস্ত ক্রিয়া করা হয়, কিন্তু পরবর্ত্তীকালে একমাত্র পরমাত্মার শরণে গীতোক্ত সাধনা পথে নিযুক্ত হতেই হয়। গীতা শাশ্বত শান্তি অনন্ত জীবন এবং অবিনাশী পদ প্রদান করে। ভারতের সম্পূর্ণ অধ্যাত্ম এবং আত্মস্থিতি প্রদানকারী সাধনা-ক্রম সম্বন্ধে গীতাশাস্ত্রে স্পষ্ট করে বর্ণনা করা হয়েছে। এটা মানুষ মাত্রের ধর্মশাস্ত্র, বিশ্বগুরু ভারতের মহাপুরুষ দ্বারা সমগ্রভাবে অন্বেষিত ধর্মের সমস্ত সিদ্ধান্ত এর মধ্যে উল্লিখিত। এই শাস্ত্র কোন সম্প্রদায় বিশেষের নয়, অপিতু এটা মানব

দর্শন। এই শাস্ত্র দ্বারা নির্ধারিত কর্মের পালন করে মানুষ পরম শ্রেয় লাভ করে। সেইজন্য ভগবান বলেছেন -

সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বা সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ।। (গীতা, ১৮/৬৬)

এই ধর্ম, সেই ধর্ম, অর্জুন! সকল ধর্মাধর্মের অনুষ্ঠান পরিত্যাগ পূর্বক একমাত্র আমার শরণাগত হও, আমি সকল পাপ থেকে তোমাকে মুক্ত করব, শোক করো না। সেইজন্য একমাত্র পরমাত্মার শরণাগত হওয়া হল ধর্ম এবং এর বিধি হল গীতা।

বেদ এবং 'দেবী'

গীতা শাস্ত্রে এত স্পষ্ট ভাবে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তবুও গোটা ভারতে দেবী পূজা প্রচলিত। দেবী-পূজা আধুনিককালে শুরু হয়েছে। এই পূজা পদ্ধতি গীতাশাস্ত্রের বিরোধিতা করে, অবৈদিক-এর বিরোধে বহু জ্ঞানী ব্যক্তি ঋগ্বেদের (১০/১২৫/১-৮) ছন্দোবদ্ধ মন্ত্রগুলিকে দেবী উপাসনার সঙ্গে সম্বন্ধীত বলে থাকেন এবং এর সঙ্গে আরো দু'চারটি মন্ত্র জুড়ে দেব্যথর্বশীর্ষ মন্ত্রটিকেও দেবী পূজার প্রমাণ স্বরূপ প্রস্তুত করেন, যদ্যপি ঋগ্বেদের (১০/৯০/২)-এ উল্লিখিত আছে যে, সহস্রশীর্ষ পুরুষ '**এবেদম্ সর্বম্ যদ্ভূতম্ যচ্চ ভব্যম্**' - এই সংসারে অতীতে যা ছিল, বর্তমানে যা আছে, ভবিষ্যতে যা ঘটবে, সে সমস্ত পুরুষ দ্বারাই সম্পাদন হবে (এর কারণ কোন দেবী নয়)। হিরণ্যগর্ভ মন্ত্রটিতে বলা হয়েছে - '**হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ততাগ্রে ভূতস্য জাতঃ পতিরেক আসীত।**' (১০/১২১/১) সেই হিরণ্যগর্ভ পরমাত্মা 'অগ্রে সমবর্তত' - সকলের পূর্বে ছিলেন এবং '**জাতস্য ভূতস্য একঃ পতিঃ আসীত**' - তিনিই দৃশ্যমান্ জগতের একমাত্র প্রভু ছিলেন। তিনিই এই পৃথিবী এবং অন্তরীক্ষ ধারণ করে আছেন। এঁর অতিরিক্ত আমরা কোন্ (দেবী) দেবতাকে হবি দ্বারা পূজা করব? যতদূর প্রশ্ন ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে বর্ণিত দেবীর ছন্দোবদ্ধ মন্ত্রের, তা এই মন্ত্রের মন্ত্রদ্রষ্টা অম্ভৃণ ঋষির 'বাক্' নামক এক বিদুষী কন্যা ছিলেন, যিনি তপস্যা দ্বারা পরমাত্মার সঙ্গে একীভূত হয়েছিলেন। তিনি নিজের অনুভূতি আটটি মন্ত্রে ব্যক্ত করেছেন যেমন -

অহং রুদ্রেভির্বিবসুভিশ্চরাম্যহমাদিতৈরুদ্র বিশ্বদেবৈঃ। অহং মিত্রা
বরুণোভা বিভর্ম্যহমিন্দ্রাগ্নি অহমশ্বিনোভা। (ঋগ্বেদ, ১০/১২৫/১)

অর্থাৎ আমি রুদ্রগণ এবং বসুগণের সঙ্গে বিচরণ করি। আমি আদিত্য এবং বিশ্বদেবগণের সঙ্গে বাস করি। হুবহু সেই বর্ণনা যেরূপ পূর্বে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতাশাস্ত্রে অর্জুনকে দর্শন করিয়েছিলেন - '**পশ্যাদিত্যান্ বসূন্ রুদ্রানশ্বিনৌ মরুতস্তথা।**' (১১/৬) এই প্রকার অন্য মন্ত্রের সঙ্গে সাম্যও গীতাশাস্ত্রে দেখা যায়।

উপনিষদ এবং 'দেবী'

দেবী পূজার প্রাচীনতা এবং প্রামাণিকতা প্রদর্শিত করার জন্য কেনোপনিষদের

তৃতীয় খন্ডে হৈমবতী উমার কাহিনী প্রমাণ স্বরূপ প্রস্তুত করা হয় যাতে উল্লিখিত আছে যে, যখন পরব্রহ্ম দেবগণকে বিজয়ী হতে সাহায্য করেছিলেন তখন দেবগণ এটা নিজেদের মহিমা, পরাক্রম ভাবতে শুরু করেছিলেন। পরমাত্মা যক্ষরূপে তাঁদের সমক্ষে প্রকট হয়েছিলেন এবং অগ্নিকে একটা খড় (শুষ্ক তৃণ) দগ্ধ করতে বলেছিলেন, কিন্তু অগ্নি এ কাজে অসমর্থ হয়েছিলেন। যক্ষ বায়ুকে একখানা খড় উড়াতে বলেছিলেন বায়ুও এ কাজে অসমর্থ হয়েছিলেন। ইন্দ্র যক্ষের পরিচয় জানতে আগ্রহী হয়েছিলেন কিন্তু যক্ষ অন্তর্ধান হয়েছিলেন।

স তস্মিন্নেবাকাশে স্ত্রিয়মাজগাম বহুশোভমানামুমাম্ হৈমবতীং
তাং হোবাচ কিমেতদ্ যক্ষমিতি।। (কেনোপনিষদ, ৩/১২)

অর্থাৎ ঠিক সেই সময় ইন্দ্র আকাশে স্বর্ণিম আভাযুক্ত এক অপূর্ব সুন্দর স্ত্রী উমাকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন এবং তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যক্ষরূপে কে এসেছিলেন? তিনি উত্তরে বলেছিলেন যক্ষরূপে স্বয়ং পরব্রহ্ম প্রকট হয়েছিলেন। এখানে হৈমবতীর অর্থ স্বর্ণিম আভাযুক্ত স্বীকার না করে হিমাচল নরেশের কন্যা বলে 'স্ত্রী' শব্দের অর্থ দেবী প্রযুক্ত করে কিছু ব্যক্তি পৃথকভাবে তাঁর আরাধনা করতে শুরু করেছিলেন। তাঁকে পরব্রহ্মস্বরূপিনী ভগবতীরূপে স্বীকার করেছিলেন, পরন্তু সেই দেবী নিজের থেকে পৃথক পরব্রহ্ম পরমাত্মার দিকে ইঙ্গিত করেছিলেন, তাঁর পূজা করতে বলেননি। এখানেও সেই তথ্যের পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে, যেরূপ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতাতে বলেছেন যে অর্জুন! যা যা ঐশ্বর্যযুক্ত, কান্তিযুক্ত এবং শক্তিযুক্ত সেই সকলই আমার শক্তির অংশসম্ভূত বলে জানবে। (গীতা, ১০/৪১) সপ্তম অধ্যায়ে তিনি বলেছেন যে, আমার থেকে শ্রেষ্ঠ সংসারে আর কিছু নেই।

এই প্রকার বিভিন্ন দেবীর নামে লিপিবদ্ধ উপনিষদ যেমন - দেব্যুপনিষদ্, সীতোপনিষদ্, রাধোপনিষদ্, ত্রিপুরোপনিষদ্, দশোপনিষদ্ ইত্যাদি বিভিন্ন বিচারকদের রচনাসমূহ আছে যেগুলিকে মনীষীগণ বেশী গুরুত্ব দেননি। গীতাশাস্ত্র, বেদ এবং উপনিষদ সর্বত্র একমাত্র পরমাত্মারই নির্দেশ করেছে।

স্বামী রামকৃষ্ণদেবও এই উপদেশ দিয়েছেন। তাঁর বড়ভাই তাঁকে কালীমন্দিরে পূজা-অর্চনার কাজে নিযুক্ত করিয়েছিলেন। তোতাপুরী মশাইয়ের শিক্ষার তাঁর উপর অনেক প্রভাব ছিল। তিনি সংসারের প্রতি আসক্তি বিহীন শিষ্যদের বলেছিলেন, ত্রেতাতে যিনি রাম রূপে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, দ্বাপরে যিনি কৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, তাঁদেরই আত্মা আমার ভিতর ওতপ্রোত, আমি স্বরূপ লাভ করেছি। তোমরা যেন সন্দেহ না কর। এইপ্রকার তাঁর শিক্ষার মূলে ছিল মহাপুরুষের স্বরূপের ধ্যান। তাঁর প্রধান শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দের প্রবচনে সর্বত্র গীতা এবং উপনিষদের শিক্ষা অনুসরণ করার নির্দেশ পাওয়া যায়। এইপ্রকার একমাত্র পরমাত্মার পূজা ছাড়া অন্য কোন স্থানে তাঁর পূজার নির্দেশ কখনই দেওয়া হয়নি। বর্তমানে চারটি বর্ণ এবং অসংখ্য উপজাতিতে বিভাজিত ভারতীয় সমাজে একমাত্র পরমাত্মার স্থানে অসংখ্য দেব-দেবীর পূজা-অর্চনা

প্রচলিত। ব্রাহ্মণ সরস্বতী, ক্ষত্রিয় দুর্গা, বৈশ্য লক্ষী এবং শূদ্র বনদেবী, ভূত-ভবানীর পূজাতে জড়িয়ে আছে যাদের নাম উল্লেখ পর্যন্ত গীতা-শাস্ত্রে করা হয়নি।

ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণেও বিচার করলে দেবী-পূজার উল্লেখ কোন যুগে দেখা যায় না। সত্যযুগে বেদবতী নামক ঋষি কন্যা ভগবৎ প্রাপ্তির নিমিত্ত তপস্যা করছিল। রাবণ দ্বারা ব্যবধান উৎপন্ন হওয়াতে সে নিজদেহ অগ্নিতে অর্পিত করে নিজেকে রক্ষা করেছিল। দেবাসুর-সংগ্রামে দেবগণ যুদ্ধ করেছিলেন, অসুরবালারা যুদ্ধ করেছিল; কিন্তু দেবীগণ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেননি। হিরণ্য কাশ্যপের ভগিনী হোলিকা পরাক্রম প্রদর্শিত করতে গিয়ে অগ্নিতে ভস্মীভূত হয়েছিল। ইন্দ্র কয়াধূকে অপহরণ করেছিল। হিরণ্যাক্ষ পৃথিবী মাতাকে অপহরণ করেছিল। যজ্ঞকুণ্ডে নিজের আহুতি দিয়ে সতী নিজের অপমানের প্রতিরোধ করেছিলেন। অতএব সত্যযুগে দেবীগণের পরাক্রমের কোনপ্রকার উল্লেখ ইতিহাসে নেই।

ত্রেতাযুগে রাবণের অত্যাচারে বিশ্ব ত্রস্ত ছিল। রাবণ '**দেব জচ্ছ গন্ধর্ব নর কিন্নর নাগ কুমারি। জীতি বরী নিজ বাহুবল বহু সুন্দর বর নারি।**' রাবণ দেবকন্যা, নারীদের, নাগকন্যাদের বাহুবলে অপহরণ করেছিল। অসুর বালাদের মধ্যে তাড়কা আক্রমণ করেছিল, সূর্পণখা, অয়োমুখী আক্রমণ করেছিল, কিন্তু দেবীদের পরাক্রমের একটাও উল্লেখ নেই ত্রেতাযুগে।

দ্বাপরে ভৌমাসুর (নরকাসুর) যোলো হাজার কন্যাকে বন্দিনী করে রেখেছিল, এদের মধ্যে দেবকন্যারাও ছিল। সে দেবমাতা অদিতির কানের কুন্তল কেড়ে নিয়েছিল। জয়দ্রথ দ্রৌপদীকে অপহরণ করেছিল। অর্জুনের অভিরক্ষাতে যে নারীদের নিয়োগ করা হয়েছিল, তাদের কোল-ভীল জাতির ব্যক্তিরা বলপূর্বক অপহরণ করেছিল। এখানেও দেবীদের উপর অত্যাচার করা হয়েছে, তাদের অপহরণ করা হয়েছে। এদের রক্ষা করার দায়িত্ব সদৈব পুরুষদেরই দেওয়া হয়েছে। হিডিম্বা কিছু পরাক্রম প্রদর্শিত করেছিল, কিন্তু দেবীদের সফলতার কোন উল্লেখ দ্বাপরে পাওয়া যায় না। দ্বাপরে যোগমায়ারূপে এক দেবীর উল্লেখ পাওয়া যায় যিনি নন্দের কন্যা ছিলেন। তিনি শ্রীকৃষ্ণের ভগিনী ছিলেন যিনি কংসের হাত থেকে মুক্ত হয়ে আকাশে অষ্টভুজা দেবীরূপে প্রকট হয়ে বিন্ধ্য পর্বতে বাস করতে শুরু করেছিলেন তাঁর অন্য তিনজন দৈত্য শুম্ভ-নিশুম্ভ এবং বৈপ্রচিতকে বধ করার কথা ছিল। কিন্তু বিন্ধ্য ক্ষেত্রের ইতিহাসে এইরূপ কোন যুদ্ধের প্রমাণ পাওয়া যায় না।

কলিযুগেও কন্যাদের অপহরণ হয়ই। মহমুদ গজনবী মথুরা থেকে হাজার হাজার মহিলাদের অপহরণ করেছিল এবং গজনীর বাজারে দু-দু' টাকাতে বিক্রি করেছিল। যে দেবীগণ রাজস্থানে পূজিত হন, যেমন - আওণজী এবং তাঁর সাতজন বোন, এঁরা সকলেই মুসলমানদের ভয়ে সিন্ধ মুলতান প্রদেশ থেকে রাজস্থান এবং গুজরাটে আশ্রয় নিয়েছিলেন। মুসলমানদের অত্যাচার থেকে রক্ষা পেতে রাজপুতানাতে কন্যাদের জন্মের পরই মেরে ফেলার কুপ্রথা ছিল। তাদের ভয়েই ভীত হয়ে মহিলাদের পর্দাপ্রথা

মেনে নিতে বাধ্য করা হয় অন্যথা প্রাচীন ভারতে পর্দাপ্রথা ছিল না, মহিলারা শিক্ষিত ছিলেন। রাজস্থানের বহু বীরপুরুষ মহিলাদের সম্মান রক্ষার্থে প্রাণ উৎসর্গ করেছেন। বিগত হাজার বছর ধরে যে যে চারণবালা দেবীরূপে মন্দিরে স্থাপিত, কেউ সিংহে আরূঢ়। তাঁরা কেউই দুষ্টকে শাস্তি দিচ্ছেন দেখা যায়নি। আজও স্ত্রীজাতির প্রতি অত্যাচারের কাহিনীতে খবরের কাগজ ভর্তি আমরা দেখে থাকি। হ্যাঁ পুরাণগুলিতে এবং মন্বাদিকৃত হিন্দুধর্মের শাস্ত্রগ্রন্থে দেবী পূজার উল্লেখ পাওয়া যায়। প্রায় দুহাজার বছর পূর্ব থেকে ভারতের হাজার- হাজার ছোট ছোট রাজাদের রাজ্যে প্রবুদ্ধ ব্যবস্থাকারেরা সমাজকে সুব্যবস্থিত রাখার জন্য নিয়মগুলিকে ধর্ম বলে; যে মহাপুরুষদের প্রতি জনসাধারণের অটুট শ্রদ্ধা ছিল, তাঁদের নামে স্মৃতিগ্রন্থের রচনা করে, যেমন - ব্যাস-স্মৃতি, নারদ-স্মৃতি, মনু-স্মৃতি, যাজ্ঞবল্ক্য-স্মৃতি, দেবল-স্মৃতি ইত্যাদি শত শত স্মৃতিগ্রন্থ সমাজের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছেন। এই স্মৃতিগ্রন্থ গুলিতে উল্লেখ আছে যে, মনু প্রভৃতি ঋষিগণ চতুর্বেদ থেকে অন্বেষণ করে সমাজে চারটি বর্ণের প্রচলন করেছিলেন (যদ্যপি মনু মহারাজা ছিলেন, ঋষি ছিলেন না)। ব্রাহ্মণ ন্যায় করবেন, দান দক্ষিণা গ্রহণ করবেন। ক্ষত্রিয় সুরক্ষা ব্যবস্থা দেখবেন। বৈশ্য উদ্যোগ ব্যবসা এবং পশুপালন করবে। শূদ্র নিজের থেকে শ্রেষ্ঠ অন্য তিনটি বর্ণের ব্যক্তিদের সেবা করবে। কর্মের এই বিভাজন ভগবান করেছেন, গীতাশাস্ত্রে এইরূপ উল্লেখ আছে। গীতাশাস্ত্র অধ্যয়ন করে লোকেরা সত্যি কি জানতে পারবে তাই একথা প্রচারিত করা হয়েছিল গীতাশাস্ত্র ঘরে রাখবে না, তা নাহলে ছেলে আপনার সাধু হয়ে যাবে, বংশের কি হবে পিতৃপুরুষদের পিণ্ডদান কে করবে? মহাভারতের একটা অংশ গীতাশাস্ত্র। মহাভারত সভ্যতার শুরু থেকে শৌর্য, পরাক্রম এবং সংস্কৃতির গ্রন্থ; দিগ্বিজয়, ত্রৈলোক্য বিজয়ের গাথা এতে উল্লিখিত। অস্ত্র-শস্ত্র আবিষ্কারের সম্বন্ধে উল্লেখ করা হয়েছে। মহাভারত হল সমাজশাস্ত্র। ভারতীয়দের আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে অনুসন্ধান কত উন্নত? এর জন্য গীতাশাস্ত্রটি পৃথকভাবে এতে সংকলিত করা হয়েছে যাতে কেউ এই যোগগ্রন্থে অন্য বিষয় যোগ না করতে পারে, যাতে ভ্রান্তি উৎপন্ন না করতে পারে, এই অবস্থাতে প্রচারিত করা হয়েছিল যে, মহাভারত কেউ যদি পাঠ করে শ্রবণ করবে না, তা না হলে ঘরে মহাভারতের মত বিপ্লব, বিনাশ হবে। ব্রাহ্মণ ব্যতীত মহাভারত পাঠ করার কেউ যোগ্য নয়। এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কেউ হাতে অস্ত্র তুলে নিতে পারে এই সম্ভাবনা দেখে নিয়ম তন্ত্র বানানো হয়েছিল যে, শস্ত্র সঞ্চালন শুধু ক্ষত্রিয় করবে। এই প্রকার শিক্ষা বিহীন, শাস্ত্রবিহীন, শস্ত্রবিহীন, ইতিহাস-বিহীন, সংস্কৃতিবিহীন পথভ্রান্ত ছোট ছোট দলে বিভক্ত ভারতীয় সমাজ। ধর্মের নতুন নতুন ব্যাখ্যা শ্রবণ করে ধর্মভীরু জনসাধারণ আতঙ্কিত হয়ে উঠেছিল। মানুষের মনে শ্রদ্ধা থাকাটা স্বাভাবিক। ধর্মের নাম করে, বিধি- বিধানের নাম করে দেবী-দেবতা, ভূত-ভবানী, তাদের যাকেই পূজা করতে বলা হয়েছিল, সমাজ তাদের পূজাতেই জড়িয়ে পড়েছিল।

বাল্যকালে আমিও শুধু দেবী-পূজাই দেখেছিলাম। দেবীর বিশাল মন্দির ছিল। সাঙ্গিয়া দেবী, চামুণ্ডা দেবী, নাগণচা দেবী। রাজস্থানে শুধু দেবী পূজা প্রচলিত। অধিকাংশ দেবীগণ চারণ কুলে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। কোন দেবী সপ্তম-অষ্টম শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ

করেছিলেন, আবার যে দেবী ৩০০ বছর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেছেন, তিনিও দেবীরূপে পূজিত হচ্ছেন। জনশ্রুতি আছে যে, এঁদের মধ্যে আওনজী সহ সাতজন দেবীর জন্ম জৈসলমের (মাডপ্রদেশ)-এ মামড় চারণের ঘরে হয়েছিল। (এই সাতটি কন্যাই হিঙ্গলাজ মন্দিরে সেবিকা ছিলেন যাঁদের সিন্ধ-মুলতানের সুলতান বিবাহ করতে চেয়েছিলেন। সুলতান এঁদের কারাগারে আটক করেছিল, বন্দীগৃহের রক্ষক তাঁদের সেখান থেকে মুক্ত করে গুজরাট এবং রাজস্থান পাঠিয়ে দিয়েছিল। মুসলমানদের হাত থেকে এঁদের রক্ষা করতে গিয়ে সেই রক্ষককে তার একটা পা খোয়াতে হয়েছিল।) কাঠের পিঁড়ি (সহঁগা) তে বসতেন বলে আওনজীকে সাঙ্গিয়াজী বলা হত। ইনি সাঙ্গ (বল্লম) ধারিণী। করণী দেবীর জন্ম সুবাপ (জোধপুর)-এ চারণ মেহার ঘরে হয়েছিল। তাঁর আশীর্বাদে জোধপুর এবং বিকানের রাজ্যের স্থাপনা হয়েছিল। দেসনোক-এ এঁর একটা প্রসিদ্ধ মন্দির আছে। জয়পুরে জীণমাতা চহুঁবাণ রাজপুত কুলে উৎপন্ন হয়েছিলেন। এই প্রকার রাজপরিবারের দেবী, লোকদেবী, কুলদেবীর অতিরিক্ত পরিবারে যদি কোন মহিলা সতী হয়েছেন তবে তিনিও দেবীরূপে পূজিত হচ্ছেন। পিতৃ-পিতরাণী প্রভৃতিদের পূজা করা হয়। এই প্রকার রাজস্থানের সমস্ত কুলদেবীগণ আধুনিক কালে অস্তিত্বে এসেছেন, আমাদের পূর্বজা। তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা-নিবেদন করা উচিতও কিন্তু পূজা তো একমাত্র পরমাত্মাকে করা উচিৎ এবং গীতোক্ত বিধি অনুসারেই করা উচিৎ।

বৈষ্ণবী দেবী

যে যে গ্রন্থে দেবী মহিমা বর্ণিত সেগুলিতে প্রকৃতি অর্থাৎ মায়াকেই সর্বশক্তিমান পরব্রহ্ম স্বরূপিনী মনে করে তাঁদের অতিরঞ্জিত পরাক্রমের বর্ণনা করা হয়েছে। আমাদের প্রকৃতির অতীত হতে হবে। সকল দেবীকে ভগবতীর রূপ বলে মনে করা হয়। এঁদের মধ্যে তিনজন হলেন প্রমুখ, যাঁরা ত্রিদেবের স্ত্রী। ব্রহ্মার স্ত্রী ব্রহ্মাণী যাঁকে সরস্বতী বলা হয়, কেউ কেউ তাঁকে ব্রহ্মার কন্যা বলে থাকেন। শিবের স্ত্রী পূর্বে সতী, পরবর্তীকালে পার্বতী হয়েছিলেন এইরূপ বলা হয়। বিষ্ণুর স্ত্রী লক্ষ্মী ছিলেন। এমন কোন দেবতা নেই যিনি বিবাহিত নন। ৩৩ কোটি দেবতা জানা নেই কতদিন ধরে আছেন এবং এত সংখ্যাতেই তাঁদের স্ত্রীগণ রয়েছেন এবং দেবতাদের বংশবৃদ্ধিও হচ্ছে। যেখানেই লাল রং মাখানো হবে, সেখানেই একজন দেবতার সংখ্যা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হবে। বৈষ্ণবী দেবীর বিমান ঘাঁটির নিকট একজন নককটী দেবীর নিবাস স্থান রয়েছে।

মির্জাপুরে গড়বড়া দেবী নামে এক দেবীর পূজা প্রচলিত আছে - এগুলি শাস্ত্রোক্ত নাম তো নয়।

এই প্রকার জম্মু কাশ্মীরে একজন বৈষ্ণবী দেবী পাহাড়ের উপর বিরাজিত। তাঁর বিষয়ে বলা হয় যে, ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং মহেশ অসুর থেকে ত্রস্ত হয়ে উঠেছিলেন। বিধাতা তাঁদের বলেছিলেন যে, এদের আশীর্বাদ তো আমরাই দিয়েছি সেইজন্য এরা অজেয় হয়ে উৎপাত ঘটাচ্ছে। তাঁদের তিন দেবীও এই বার্তালাপ শুনছিলেন। তাঁরা নিজেদের মধ্যে

বিচার বিমর্শ করেছিলেন যে, আমরাই তাহলে কিছু বিহিত করি। তাঁরা তিনজনই নিজেদের শক্তি একত্র করে সেই তেজ থেকে তাঁদের একটি প্রতিমূর্তির নির্মাণ করেছিলেন; তার ভিতর শক্তি আরোপিত করেছিলেন, প্রতিমূর্তি দেবী হয়ে উঠেছিলেন। তিনজন দেবীই নিজের নিজের শস্ত্র দিয়ে বলেছিলেন যে 'এই অসুরদের বধ কর' তখন সমস্ত রাক্ষসকে সেই দেবী বধ করেছিলেন। তদনন্তর সেই দেবী বলেছিলেন যে মাতাগণ! এখন আমি কি করব? তখন দেবীগণ বলেছিলেন যে, পৃথিবীতে তোমার এখন আরও প্রয়োজন আছে, তুমি পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ কর।

একজন গরীব লোক বিষ্ণুভক্ত ছিল। তাকে বিষ্ণু ভগবান স্বপ্নে দর্শন দিয়ে বলেছিলেন যে, তোমার ঘরে এক কন্যা জন্ম গ্রহণ করবে যে খুবই ভাগ্যশালিনী হবে, দেবীতুল্য হবে। একথা শুনে সেই গরীব ব্যক্তিটি খুবই আনন্দিত হয়েছিল। কন্যারত্ন উৎপন্ন হয়েছিল, একটু বড় হয়ে সে তার পিতাকে বলেছিল আমি তপস্যা করব। একথা শুনে পিতা স্বপ্ন নিয়ে ভেবে দেখেছিলেন এবং অনুমতি দিয়েছিলেন যে ঠিক আছে যাও তুমি কর ভজনা। মেয়েটি জঙ্গলে গিয়ে তপস্যা করতে শুরু করেছিল। রাম লক্ষণ সীতাকে খুঁজতে খুঁজতে সেদিকে গিয়েছিলেন। মাঝপথে কন্যাটিকে দেখেছিলেন, কন্যাটি দু-ভাইকে দেখে খুব আনন্দিত হয়েছিল যে, রামকে দর্শন করলাম। সে রামকে জিজ্ঞাসা করেছিল আপনারা কোথায় যাচ্ছেন? কাকে খুঁজছেন? আপনারা উদাস কেন? তার কথা শুনে রাম বলেছিলেন যে, আমার ভার্যা সীতা হারিয়ে গেছে, তাকেই খুঁজছি। শুনে সে খুব দুঃখিত হয়েছিল যে, এর তো বিবাহ হয়ে গেছে। রাম তার মনের ভাব টের পেয়ে বলেছিলেন তুমি চিন্তা কোরো না। আমি সীতাকে খুঁজে বার করি; তারপর তোমার কাছে আসব। যদি তুমি আমাকে চিনতে পার, তবে তোমার মনোস্কামনা পূর্ণ হবে, অন্যথা নয়। সে রামের প্রতিক্ষা করতে শুরু করেছিল। পরবর্তীকালে রাম এক বিচিত্র বেশে তার নিকট গিয়েছিলেন, বলেছিলেন - আমি এসেছি। এ কথা শুনে দেবী ক্রুদ্ধ হয়ে বলেছিলেন - আমি আবার তোমাকে কখন ডেকে পাঠালাম। রাম বলেছিলেন - ঠিক আছে, ডাকোনি, তবে আমি যাই। যখন তিনি চলে যাচ্ছিলেন তখন দেবীর মনে পড়েছিল যে ভগবান বলেছিলেন যে, আমি আসব। ইনিই তো রাম নন। এই ভেবে দেবী তাঁকে বলেছিলেন - দাঁড়াও। তুমি রাম নও তো। তখন রাম স্বীয়রূপ ধারণ করে বলেছিলেন তুমি আমাকে চিনতে পারোনি সেইজন্য বলছি এখন আমাদের মিলনের সময় হয়নি। কলিযুগের প্রথম চরণে তোমার আমার সঙ্গে মিলন হবে। ততদিন পর্যন্ত তুমি হিমালয়ের পাদদেশে বসে ভজনা কর, ততদিনে তোমার মহিমা বহুদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়বে।

যখন সব নিশাচরদের দেবী বধ করেছিলেন তবে এই যে সুমালী, রাবণ প্রভৃতি রাক্ষসগণ এরা যে জন্মগ্রহণ করেছিল এবং রাবণ এক লক্ষ বছর পর্যন্ত উৎপাত করেছিল তবে তিনজন দেবী দ্বারা সৃষ্ট দেবী কাকে মেরেছিলেন, রাক্ষসগণ তো যথাবৎ অত্যাচার করে যাচ্ছিল? তারপর কয়েক লক্ষ বছরের যুগ ত্রেতা পার হয়েছিল, দ্বাপর লক্ষ লক্ষ বছরের ছিল, তাও পার হয়ে গিয়েছিল, কলিযুগ শুরু হয়েছিল তাও কিছুকাল ব্যতীত হয়েছে এখনও দেবী প্রতীক্ষা করছেন।

নাথ সম্প্রদায়ের একজন মহাপুরুষ সেই পাহাড়ের উপরই থাকতেন। তিনি নিজের শিষ্যকে বলেছিলেন যে, দেখ, দেবীর মন্দিরের দিকে এত লোক যাচ্ছে, তার যশ চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ছে। ভৈরবনাথ, খবর নাও তো। ভৈরবনাথ নবযুবক ছিল। সে দেবীকে অনুসরণ করেছিল, এই দেখে দেবী এক গুহার ভিতর গিয়েছিলেন এবং ত্রিশূল বাইরে ছুঁড়ে ফেলেছিলেন তারপর গুহার ভিতর অদৃশ্য হয়েছিলেন। এতে ভৈরবনাথ বলেছিল যে, এটা আমার একটা ক্ষুদ্র ত্রুটি। যদি আমার মন বিচলিত হয়েও থাকে তবু আপনি কি আমাকে মৃত্যুদণ্ড দেবেন? আমাকে ক্ষমা করে দিন। তার মিনতিতে প্রসন্ন হয়ে দেবী তাকে জীবনদান দিয়েছিলেন। সেই তখন থেকে দেবীর সঙ্গে ভৈরবেরও পূজা হয়ে আসছে। এইপ্রকার ত্রেতাযুগ থেকে আজ পর্যন্ত এইভাবেই দেবী পূজা হচ্ছে কিন্তু দেবীর ভগবানের সঙ্গে মিলনের শুভমুহূর্ত এখনও হয়নি।

একথা বিচারযোগ্য যে, যতগুলি দেবী মন্দির দেখা যায় সব কটা ৮০০-৯০০ বছরের মধ্যেই তৈরী হয়েছে। রাজস্থানের অধিকাংশ দেবী চারণদের কন্যা। চারণ অর্থাৎ রাজাদের স্তুতিপাঠক। কিছু কিছু রাজপুতদের কন্যাও আছে। এঁরা যতদিন ধরাধামে থেকেছেন সাত্ত্বিক আহার গ্রহণ করেছেন, ব্রত পালন করেছেন, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন কিন্তু যখন দেহত্যাগ করেছেন তখন এই দেবীদের মন্দিরে ছাগবলি হয়, ভেড়া বলি দেওয়া হয়, মহিষ বলি দেওয়া হয়। নবরাত্রিতে একশো আটটি মহিষ বলি দেওয়া হয়। তবে কি দেবী পরলোক গমনের পর মহিষ খাওয়া শুরু করেছেন? মুসলমানদের আক্রমণের সময় রাজপুত বীরগণ তলোয়ার হাতে নিয়ে দেবীদের রক্ষা করার জন্য মুসলমানদের সঙ্গে অনবরত যুদ্ধ করে গেছেন। যখন দেবীগণ পৃথিবীতে ছিলেন তখন তো এঁরা তলোয়ার হাতে ছুটে যাননি; দেহত্যাগের পর চতুর্ভুজ, অষ্টভূজ, হাজার ভুজাযুক্ত হয়ে গেছেন? জীবিত ছিলেন যখন তখন সংযমপূর্বক জীবনযাপন করেছিলেন এবং দেহত্যাগের পর বলেছেন এত মেষ, এত মহিষ .... মদ...। কি এসব? এ সবই ব্যবস্থা মাত্র, ধর্ম নয়।

রাজপুত সমাজ সাধারণতঃ অত্যন্ত ভাবপ্রবণ এবং ভক্ত দেখা যায়। পূজারী মশাই যা কিছু ধর্ম বলে বলেছেন, তাই তারা স্বীকার করে নিয়েছে। তাঁকে তাঁর কথা স্বীকার করে তাঁর প্রতি মান প্রদর্শিত করেছে অথবা করেনি কিন্তু তাঁর পুরোহিত বেশকে সর্বদা মান দিয়েছে। যদি কোন রাজপুত তর্ক করেও, মায়েরা বারণ করেন। মাতৃ আজ্ঞা মর্যাদিত রাজপুত কিরূপে অস্বীকার করতে পারে। সারা জীবন এই কন্যারা কি কি ব্রত পালন করে, সাধনা কিরূপে করে, কি উপদেশ দেয়, এ সমস্ত পুস্তাকাকারে লিপিবদ্ধ করা উচিত যাতে উত্তরপুরুষগণ তা অনুসরণ করতে পারে। সকলকে তাঁদের কাছ থেকে আশীর্বাদ নেওয়া উচিত, খাওয়া-দাওয়া সংযমপূর্বক করা উচিত। জীবিত থাকাকালীন উটের পীঠে যাতায়াত করেছেন, দেহত্যাগের পর সিংহবাহিনী? এসব কি? সমস্তই অতিশয়োক্তি এবং অতিরঞ্জিত কাহিনী। সমাজের কাছে সত্যটা কি তা আসা উচিত। মাঝে যে কাহিনীগুলির জন্য ভগবানের বিস্মৃতি হয়েছে, এগুলির উপর মানুষকে বিচার করা উচিত।

দেবী মন্দিরে মাংস-মদিরা প্রয়োগের প্রশ্ন যতদূর, মনে হয় প্রাচীনকালে রাজা-মহারাজাদের দ্বারা অর্পিত ভোগ রাগ অস্বীকার করার অথবা সমাজের খাওয়া-দাওয়া নিয়ন্ত্রিত করার সাহস সেই সমস্ত চারণ কন্যা অথবা পূজারীদের ছিল না। তারা শুধু ভক্তদের আশীর্বাদ দিতে জানতেন। দেশ-কাল পরিস্থিতিবশতঃ খাওয়া-দাওয়া, পরিধান এবং নিবাসের নির্ধারণ হয়ে আসছে। মানুষ জীবনযাপন করুক কিন্তু খাদ্য সামগ্রীকে দেবী পূজার বিধান বলে স্বীকার না করুক।

পৃথিবীতে যত তত্ত্বদর্শী মহাপুরুষ হয়েছেন, মহিলারাও তাঁদের থেকে কোন অংশে কম ছিলেন না। সৃষ্টির শুরুতে মাতা মদালসা অনেক বড় তপোধন রূপে খ্যাতি লাভ করেছিলেন। সাবিত্রী নিজের সত্যব্রতের জোরে, পাতিব্রত্য ধর্মের জোরে যমের কবল থেকে পতি সত্যবানকে মুক্ত করেছিলেন। এইরূপ মাতা অনুসুইয়া যাঁর স্বামী অত্রি মহারাজ সপ্তর্ষিদের মধ্যে একজন ছিলেন। যখন অত্রি ঋষির তপস্যা পরাকাষ্ঠাতে পৌঁছেছিল সেই সময় দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল। অত্রি মহারাজ নিজের স্ত্রীকে একদিন জল আনতে বলেছিলেন তখন মাতা অনুসুইয়া নিজের তপস্যার জোরে জলধারা সৃষ্টি করে দিয়েছিলেন। সেই সময় গঙ্গা, যমুনা এবং সরস্বতী, লক্ষী এবং পার্বতীর নিকট গিয়েছিলেন। নারদ তাঁদের বলেছিলেন, আপনাদের কষ্ট করে এতদূর আসার কোন প্রয়োজন ছিল না। মর্ত্যলোকে মাতা অনুসুইয়া আছেন। তাঁকে দর্শন করে নিলেই পাপ প্রক্ষালন করা হবে। তিন মহাদেবীই ঈর্ষান্বিত হয়ে পড়েছিলেন যে আমরা তো এদের পাপ ধৌত করব তবে ধৌত হবে; এখানে অনুসুইয়ার দর্শন মাত্রে এদের পাপ ধৌত হবে? তাঁরা বলেছিলেন যে, তবে যাও, অনুসুইয়ার কাছে, তাকে দিয়েই পাপ প্রক্ষালন করাও। একথা শুনে তাঁরা ফিরে এসেছিলেন এবং তাদের পাপ ধৌত হয়েছিল। এই উপলক্ষ্যে গঙ্গা একটি ধারা সেখানে প্রবাহিত করেছিলেন, যার নাম মন্দাকিনী। কিন্তু এর ফলে ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং মহেশের দেবীগণ উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিলেন। তাঁরা মাতা অনুসুইয়াকে সত্য থেকে, তাঁর পাতিব্রত ধর্ম থেকে বিচলিত করার জন্য নাগরাজকে পাঠিয়েছিলেন যে, গিয়ে অনুসুইয়ার স্বামীকে দংশন কর। নাগরাজ দেখেছিলেন, অত্রি মহারাজের স্থানে ভগবান শিব স্বয়ং বসে রয়েছেন। এ দেখে তিনি ফিরে গিয়েছিলেন। পরবর্তীকালেও এই দেবীগণ কঠিন পরীক্ষা করে দেখেছিলেন। অবশেষে মাতা অনুসুইয়ার প্রতি নিজেদের সমর্পিত করেছিলেন। এই মাতা অনুসুইয়ার শিষ্যদের মধ্যে নর্মদাও ছিলেন।

মহিলারাও পুরুষদের থেকে কম মহিমান্বিত ছিলেন না। তাঁরাও পুরুষদেরই সমান সন্ত মনোভাবাপন্ন। তাঁরাও উচ্চস্তরের সাধিকা হয়েছেন কিন্তু তার সঠিক বিবরণ দেওয়া হয়নি। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন যে, অর্জুন! পরমাত্মার অংশমাত্র থেকে অনন্ত সৃষ্টির পালন, সৃজন এবং পরিবর্তন হয়, সেই একমাত্র পরমাত্মারই পূজা করা উচিত। মহিলারা সেই ব্রত সাধনাই করেছিলেন যা সন্ত মহাপুরুষ সদৈব করে এসেছেন, অনাদিকাল থেকে যা করে আসছেন, পৃথকভাবে তাঁরা কোন ব্রত পালন করেননি, পৃথক কোন ব্রতও নেই। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন যে -

যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ততে কামকারতঃ।
ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্।।

অর্জুন! যিনি উপর্যুক্ত শাস্ত্রীয় বিধি উল্লঙ্ঘনপূর্বক স্বেচ্ছাচারী হয়ে বিহিতের আচরণ করেন না অথচ নিষিদ্ধের আচরণ করেন, তিনি সিদ্ধিলাভের যোগ্য হন না, তিনি পরমগতি এবং সুখ লাভ করতে পারেন না। সেই ব্যক্তি ধর্মপথ থেকে বিচ্যুত হয়। অতএব - **'তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণং তে...'** কর্তব্য এবং অকর্তব্যের নির্ধারণে এই গীতাশাস্ত্রই প্রমাণ। গীতা পাঠ করে এর দ্বারা নির্ধারিত বিধি অনুসারে আচরণ করুন তবেই আপনি অবিনাশী পদ লাভ করতে পারবেন, শাশ্বত পদ এবং শান্তি লাভ করবেন।

কয়েকটি কাহিনীতে উল্লিখিত আছে যে, দক্ষ যজ্ঞে সতীর দগ্ধ দেহ কাঁধে তুলে ভগবান শিব তাণ্ডব শুরু করেছিলেন তখন বিষ্ণু সেই দেহ সুদর্শন চক্রের সাহায্যে খণ্ড খণ্ড করে ফেলেছিলেন। যে-যে স্থানে সেই অংশগুলি পতিত হয়েছিল, সেখানে-সেখানে শক্তিপীঠ স্থাপনা করা হয়েছে, সেসব স্থানে আজও দেবী-পূজা হয়। যেমন - হিংগলাজ, কলকাতাতে কালী, কামরূপে কামাক্ষ্যা, মদুরাতে মীনাক্ষী, মুম্বাইয়ে মুম্বাদেবী প্রভৃতি; কিন্তু 'নানা পুরাণ নিগমাগমসম্মত' রামচরিত মানসে গোস্বামীজী এইরূপ কোন ঘটনার উল্লেখ করেননি। তিনি এইরূপ বর্ণনা করেছেন -

জব তেঁ সতী জাই তনু ত্যাগা। তব তেঁ সিব মন ভয়উ বিরাগা।
জপহিঁ সদা রঘুনায়ক নামা। জহঁ তহঁ সুনহিঁ রাম গুন গ্রামা।।

সতীর দেহত্যাগের পর থেকেই, শিবের মনে বৈরাগ্য উৎপন্ন হয়েছিল। **'জপহিঁ সদা রঘুনায়ক নামা'** - তিনি সর্বদা প্রভু রামের নাম জপ করতে শুরু করেছিলেন; **'জহঁ তহঁ সুনহিঁ রাম গুণ গ্রামা'** - তিনি যেখানে-যেখানে রামের গুণকীর্তন করা হত সে সমস্ত স্থানে গিয়ে উপস্থিত হতেন।

চিদানন্দ সুখধাম সিব বিগত মোহ মদ কাম।
বিচরহিঁ মহি ধরি হৃদয়ঁ হরি সকল লোক অভিরাম।।

তিনি মোহ, অহঙ্কার, কামনাশূন্য হয়ে **'বিচরহিঁ মহি'** - পৃথিবীতে বিচরণ করছিলেন। **'কতহুঁ মুনিন্হ উপদেসহিঁ গ্যানা।'** - কোথাও তিনি মুনিদের জ্ঞান সম্বন্ধে উপদেশ দিচ্ছিলেন **'কতহুঁ রাম গুন করহিঁ বখানা।'** - কোথাও আবার রামের গুণ সমূহের বর্ণনা করছিলেন। কাকভুশুণ্ডির নিকট রামকথা শ্রবণ করার প্রসঙ্গে শিব স্বয়ং পার্বতীকে বলেছেন -

প্রথম দচ্ছ গৃহ তব অবতারা। সতী নাম তব রহা তুম্হারা।।

পূর্বকালে দক্ষগৃহে তোমার জন্ম হয়েছিল, সেই সময় তোমার নাম সতী ছিল।

দচ্ছ জগ্য তব ভা অপমানা। তুম অতি ক্রোধ তজে তব প্রানা।।

দক্ষযজ্ঞে তুমি অপমানিত হয়েছিলে, ক্রোধান্বিতা হয়ে তুমি প্রাণ ত্যাগ করেছিলে।

তব অতি সোচ ভয়উ মন মোরেঁ। দুখী ভয়উঁ বিয়োগ প্রিয় তোরেঁ।

তোমার দেহত্যাগের পর আমি শোকে কাতর হয়ে পড়েছিলাম। তোমাকে হারিয়ে আমি খুবই দুঃখ পেয়েছিলাম।

সুন্দর বন গিরি সরিত তড়াগা। কৌতুক দেখত ফিরউঁ বেরাগা।।

সেই সময় বন, পর্বত, নদী এবং অত্যন্ত মনোরম সরোবরের দৃশ্যগুলি উদাসীনভাবে দেখতে-দেখতে তিনি বিচরণ করছিলেন। ক্রমে সুমেরু পর্বত থেকে উত্তরে নীল পর্বতের উপর একটি মনোরম সরোবরে হংসের দেহ ধারণ করে অন্যান্য নির্মল, শুভবুদ্ধি হংসদের সঙ্গে তিনি রামকথা শ্রবণ করেছিলেন। সতীর দেহ কাঁধে তুলে তাণ্ডবের কাহিনীর উল্লেখ কোথাও নেই।

যে সতী স্বয়ং ভোলানাথের সেবাতে অসফল হয়েছিলেন, তাঁর মৃতদেহের অঙ্গগুলিকে উপাসনা করে কল্যাণ কামনা করেন যাঁরা, তাঁদের বিষয়ে কি বলার থাকতে পারে! দেহের পূজা, তাও আবার মৃত দেহের অঙ্গ-উপাঙ্গের পূজা, শবদেহে উপবেশন করে আরাধনা করা, বিভৎস উপাদান দ্বারা পূজো ভারতের পরম্পরা নয়। গীতাশাস্ত্রে উল্লিখিত দৈবী সম্পদের লক্ষণগুলির আচরণই ভারতীয় মনীষীগণের কাছ থেকে প্রশংসা কুড়িয়েছে।

বস্তুতঃ শিব দ্বারা সতীর শবদেহ কাঁদে তুলে তাণ্ডব করা এটা হল একটা আধ্যাত্মিক রূপক। প্রত্যেক সাধকের সমক্ষে এই স্থিতি উপস্থিত হয়। সাধক যখন সাধনা পথে চলতে শুরু করেন, যেখানে যার প্রতি তাঁর আসক্তি থাকে, তাঁদের স্মৃতি বছরের পর বছর তাকে ভজনপথ থেকে চ্যুত করার চেষ্টা করে। তাদের স্মৃতি তার মন-মস্তিষ্ক জুড়ে থাকে, এই স্মৃতির বোঝা সে যেন কাঁধে করে বয়ে বেড়ায়। একমাত্র পরমাত্মাতে সমর্পণের সঙ্গে সাধক যখন নাম জপে, গুরু মহারাজের ধ্যানে অথবা তাঁর ব্রহ্মবিদ্যার চিন্তনে নিযুক্ত হয় তখন ভগবান ক্রমশঃ সেই স্মৃতিগুলি অপসারণ করেন এবং ঈশ্বর চিন্তাতে সুরত (মনের দৃষ্টি) স্থির করে দেন, যোগ-সাধনার শিক্ষাপ্রদান করতে থাকেন। ক্রমশঃ পূর্বের স্মৃতি অপসারিত হয়। ভগবানে মন উত্তমরূপে স্থির হয়। স্মৃতিগুলি ভগবানের কৃপাতেই অপসারিত হয়, সাধকের স্বীয় চেষ্টাতে কখনই নয় - **'মন বস হোই তবহিঁ জব প্রেরক প্রভু বরজে।'**

এর আশয় এই যে, বিষ্ণু ভগবান শনৈঃ-শনৈঃ সেই নশ্বর শবদেহকে কর্তন করেন, এই নয় যে শিব সতীর শবদেহ কাঁধে করে ফিরছিলেন। শবদেহ এমনিতেও দু'চার দিনের ভিতর পচে গলে যায়, এবং দশ-কুড়ি দিনে খণ্ড খণ্ড হয়ে পড়ে যায়, এতে কর্তন করার প্রয়োজনই কোথায়, যখনই সন্ধিস্থাপনের (বিশেষতঃ অস্থির) মেদ স্থানচ্যুত হবে তেমনি অস্থি স্বতই আলগা হয়ে যায়।

বস্তুতঃ সতী দেহত্যাগ করাতে শিব খুবই মর্মাহত হয়েছিলেন, ভজনাতে মন

বসছিল না। সতীর স্মৃতি তাড়া করছিল। নিরাধার বিচরণের ফলে মনে তীব্র বৈরাগ্য উৎপন্ন হয়েছিল, ইষ্টে মন স্থির হয়েছিল, সতীর মোহ সমাপ্ত হয়েছিল, তিনি সমাধিস্থ হয়েছিলেন।প্রত্যেক সাধককে এইরূপ পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়।

পুরাণ সাহিত্য এবং দেবী

মধু-কৈটভ

পুরাণ সাহিত্যগুলির মধ্যে মারকণ্ডেয় পুরাণে একটি কাহিনী উল্লিখিত আছে যে, সূর্যের পুত্র সাবর্ণি, যাঁকে অষ্টম মনু বলা হয়, ভগবতী মায়ার অনুগ্রহে মন্বন্তরের প্রভু হয়েছিলেন। ব্যস এখান থেকেই দেবী মাহাত্ম্য শুরু হয়েছে। মহারাজা মনু, যাঁর থেকে সৃষ্টি উৎপন্ন হয়েছে, তাঁর অষ্টম বংশধরগণের সঙ্গে সাবর্ণি উৎপন্ন হয়েছিলেন। তিনি যেকালে ছিলেন সেই সময় থেকে দেবী-পুরাণের চর্চা শুরু হয়েছিল।

এই পুরাণে উল্লিখিত আছে যে, কল্পের শেষে যখন সম্পূর্ণ জগত একার্ণবে নিমগ্ন হচ্ছিল, ভগবান বিষ্ণু শেষনাগের শয্যাতে যোগনিদ্রার আশ্রয় গ্রহণ করে নিদ্রিত হয়েছিলেন, তাঁর কর্ণকুহর দ্বয়ের মল থেকে দু'জন ভয়ঙ্কর অসুর মধু এবং কৈটভ উৎপন্ন হয়েছিল। জন্মগ্রহণের পর চারিদিকে দৃষ্টিপাত করেছিল তখন জলে পদ্মের উপর ব্রহ্মাকে বসে থাকতে দেখেছিল। অসুরগণ ব্রহ্মাকে যুদ্ধের জন্য আহ্বান করেছিল। ব্রহ্মা কিছুক্ষণ পর্যন্ত যুদ্ধ করেছিলেন, কিন্তু বুঝতে পেরেছিলেন যে, অসুরদ্বয়কে পরাজিত করতে পারবেন না, দেবতাদের আহ্বান করেছিলেন, দেবগণও পলায়ণ করেছিলেন। তখন তিনি ভগবান বিষ্ণুর নিদ্রা ভঙ্গের প্রয়াস করেছিলেন, কিন্তু ভগবানের নিদ্রা ভঙ্গ হয়নি কারণ তাঁর পলকে সেই মুহূর্তে যোগনিদ্রা দেবী বিরাজমান ছিলেন। ব্রহ্মার প্রার্থনা শুনে যোগনিদ্রা দেবী সেস্থান থেকে সরে পড়েছিলেন, ভগবান জেগে উঠেছিলেন। রাক্ষস দু'জন তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করতে শুরু করেছিল। পাঁচ হাজার বছর পর্যন্ত বিষ্ণু যুদ্ধ করে গিয়েছিলেন। অসুর দুটি খুবই প্রসন্ন হয়েছিল তাঁকে বলেছিল - তুমি ক্লান্ত হওনি, সমানে যুদ্ধ করে গেছ অতএব কিছু বর চাও। বিষ্ণু বলেছিলেন - দিতে পারবে? তারা বলেছিল - আমরা কথা দিয়ে কথা রাখতে জানি, নিশ্চয় দিতে পারব! বিষ্ণু জিজ্ঞাসা করেছিলেন - বল, তোমরা কিভাবে মারা যাবে? অসুর দুজন বলেছিল - আমাদের ফাঁদে আমাদেরই আবদ্ধ করলে! ঠিক আছে, চতুর্দিক জলমগ্ন দেখছি, আমরা শুষ্ক স্থলে প্রাণত্যাগ করতে চাই। এখানে দেহের বল অপেক্ষা বুদ্ধিবল শ্রেষ্ঠ তা প্রদর্শিত করা হয়েছে। এর প্রয়োগ করেই ভগবান সফল হয়েছিলেন। তিনি তাদের গ্রীবাদেশ ধরে নিজের জঙ্ঘার উপর আছড়ে ফেলেছিলেন এবং সুদর্শন চক্রে দুজনের ধড় থেকে মুণ্ড পৃথক করেছিলেন। অসুর দুজন নিহত হয়েছিল। ব্রহ্মা যোগনিদ্রা দেবীর স্তুতি করেছিলেন।

বস্তুতঃ যোগনিদ্রা কোন দেবী নয়, এটি যৌগিক শব্দ। যোগাভ্যাসে দেহটা জেগে থাকে, মনের বৃত্তি ঘুমিয়ে থাকে। দেহ উত্তমরূপে সচেতন থাকবে, কিন্তু মনে ভাল-মন্দ কোনরূপ উদ্বেগ উৎপন্ন হবে না। যে প্রভুকে স্মরণ করা হয়, তাঁর রূপ শুধু সম্মুখে

থাকবে- **'তদৈ বার্থমাত্রনির্ভাসং স্বরূপশূন্যমিব সমাধিঃ।'** (যোগদর্শন, ৩/৩) - লক্ষ্যমাত্রের আভাস বাকী থাকবে, চিত্তের রূপ শূণ্য থাকবে, একেই সমাধি বলে। **'তত্র প্রত্যয়ৈকতানতা ধ্যানম্।'** (যোগদর্শন, ৩/২) এইরূপ যোগনিদ্রাতে সংসার থেকে বৃত্তি সরে যায় এবং পরমাত্মার রূপে উত্তমরূপে স্থির হয়। ব্রহ্মবিদ্যার সঙ্গে সংযুক্ত বুদ্ধিই হল ব্রহ্মা। সেই বুদ্ধি প্রার্থনাতে প্রবৃত্ত থাকে যাতে যোগ-সাধনা শীঘ্র পূর্ণ হয়। স্তুতি তো ভগবানেরই করা হয়, কোন দেবীর নয়। যখনই যোগাভ্যাস পূর্ণ হয় তখন পরমাত্মার উপর নির্ভর করে আছে যে শক্তি তা উত্তমরূপে জাগ্রত হয়, যোগনিদ্রা ভঙ্গ হয় এবং বিষ্ণু অর্থাৎ পরমাত্মার সেই শক্তি যা প্রতিটি কণায় ব্যাপ্ত, অসুরদের সংহার করে।

প্রকৃতিতে দুটি ভয়ঙ্কর অসুর বিদ্যমান। এই সৃষ্টি স্বর্ণিম। প্রকৃতিতে যে মাধুর্য চোখে পড়ে, এই হল মধু নামক দৈত্য এবং এর প্রতি কর্তব্য করার যে বিবশতা তা হল কৈটভ। শুরুতে তো এটা বুঝতেই পারা যায় না। ভজনা করতে-করতে এমন একটা অবস্থা আসে যখন এই আবিলতা বেরিয়ে আসে, প্রকৃতিতে যে আবিলতা প্রচ্ছন্নভাবে রয়েছে তা স্পষ্ট হয়। রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ এবং স্পর্শ - এই পাঁচটি তন্মাত্রা-র প্রতি আসক্তিই হল মধু-কৈটভ নামের দৈত্য দুজনের সঙ্গে পাঁচ হাজার বছর পর্যন্ত যুদ্ধ। চক্ষুদ্বয় রূপ দেখে বেড়ায়, কর্ণকুহর শব্দের প্রতি ক্রিয়াশীল থাকে, জিহ্বা রস খুঁজে বেড়ায়। যতদিন এ সবে মাধুর্য অনুভব হবে, ততদিন যোগ-সাধনা নিরন্তর প্রবহমান থাকবে, ভগবান রক্ষা করবেন। যখনই রসগ্রহণের আসক্তি সমাপ্ত হবে, তেমনি প্রকৃতিও সমাপ্ত হবে! প্রকৃতির মাধুর্য সমাপ্ত হবে। নিম্নে বিষয়রূপ বারি, ঊর্ধ্বে ব্রহ্মপীযুষ ধারা প্রবাহিত বোধ হবে যতক্ষণ কিঞ্চিন্মাত্রও বিষয়রূপ বারির প্রতি আসক্তি থাকবে, ততক্ষণ সংঘর্ষ বন্ধ হবে না, সাধনা নিরন্তর চলবে, ভগবান রক্ষা করবেন। এই প্রকার যতক্ষণ প্রাপ্ত করার যোগ্য বস্তু ব্রহ্ম পীযুষ অপ্রাপ্ত ততক্ষণ এই সংঘর্ষ বন্ধ হবে না, যেহেতু সাধনা সম্পূর্ণ হয়নি। যখন বিষয়বারি সমাপ্ত হবে এবং ব্রহ্ম পীযুষও লাভ করা বাকী থাকবে না তখন জলাশয় শুকিয়ে যাবে, সেই স্তরে পৌঁছালে ভগবানের প্রত্যক্ষ জ্ঞানই তখন জঙ্ঘার রূপ। যোগ যুক্তি প্রত্যক্ষ হয়, সেই স্তরে সাধনা-চক্র পৌঁছালে প্রকৃতির প্রতি যে আকর্ষণ তা সদা-সর্বদার জন্য মিটে যায় এবং সেইজন্য তার প্রতি কোন কর্তব্যও বাকী থাকে না; মধু এবং কৈটভের সর্বদার জন্য মৃত্যু হয়। আসুরী সম্পদ সদাসর্বদার জন্য শান্ত হয়, পুরুষ স্বীয় সহজ স্বরূপে স্থিত হয়। বুদ্ধি, ব্রহ্মা অন্তঃকরণের এই বৃত্তি বাকী থাকে। এই মধু এবং কৈটভ নামের কোন রাক্ষস জন্মগ্রহণ করেনি। দৈবী সম্পদ যা পরমদেব পরমাত্মাতে প্রবেশ প্রদান করে, প্রকৃতির আসুরী বৃত্তিকে ছেদন করে, এটা তারই চিত্রণ। কিন্তু লোকে না বুঝে সেই অসুর দু'জন এবং দেবীদের মন্দির নির্মাণ করে পূজা শুরু করেছে। মধু এবং কৈটভ নামের কোন রাক্ষস জগতে জন্মগ্রহণই করেনি।

মহিষাসুর

একবার দেবতা এবং অসুরদের মধ্যে একশ বছরের জন্য যুদ্ধ বাধে। অসুররাজ মহিষাসুর অপার সেনা নিয়ে যুদ্ধ করেছিল এবং দেবতাদের পরাস্ত করে নিজে ইন্দ্রপদে

আসীন হয়েছিল। দেবতারা কাঁদতে-কাঁদতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং মহেশের কাছে গিয়েছিলেন। তিনজনই রেগে গিয়েছিলেন। তাঁরা সমস্ত দেবগণকে সংগঠিত করেছিলেন। সকলেই নিজের-নিজের তেজপুঞ্জ একত্র করেছিলেন যা শক্তি (দেবী) রূপে প্রকট হয়েছিল।

সকল দেবগণ তাকে নিজের-নিজের অস্ত্র দিয়েছিলেন। শিবের ত্রিশূল থেকে আর একটি ত্রিশূলের সৃষ্টি হয়েছিল, বিষ্ণুর চক্র থেকে চক্র! ইন্দ্র বজ্র, যম দণ্ড, সমুদ্র দুটি অপরিবর্তনীয় বস্ত্র দেবীকে অর্পিত করেছিলেন। এই দেবী (শক্তি) মহিষাসুর এবং তার সেনার সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন, এর ফলে মহিষাসুর মারা যায়। এই কাহিনী থেকে স্পষ্ট হচ্ছে যে, যখন সব দেবগণ পৃথক পৃথকভাবে যুদ্ধ করছিলেন, তাঁদের ভিতর বিরোধ ছিল, ততক্ষণ তারা পরাভূত হয়েছিলেন, পলায়ন করছিলেন। যখনই মতবিরোধ শেষ হয়েছিল, তাঁরা বিজয়ী হয়েছিলেন। যুদ্ধে জয়লাভ করার পূর্বে সব অস্ত্র-শস্ত্র পৃথক-পৃথকভাবে চালনা করা হচ্ছিল। ত্রিশূল পৃথকভাবে চালনা করা হয়েছিল। বজ্র, চক্র পৃথকভাবে চালনা করা হচ্ছিল। যখন সমস্ত অস্ত্র-শস্ত্র একসঙ্গে একটি মাত্র লক্ষ্যের অভিমুখে ধাবিত হয়েছিল তখনই দেবগণ বিজয়ী হয়েছিলেন। এইপ্রকার দুর্গা নামে পৃথক কোন দেবীর অস্তিত্ব নেই, সামূহিক দেবশক্তিকেই দুর্গা বলা হয়।

একথা বিচারযোগ্য যে, এই দেবী ব্রহ্মার ব্রহ্মাণী, বিষ্ণুর লক্ষ্মী, শংকরের পার্বতী এবং তেত্রিশ কোটি দেবতাদের স্ত্রীদের সামূহিক রচনা ছিল, শুধু পার্বতীর অংশ ছিল না। কিন্তু সেই দুর্গাকে শুধু শিবের স্ত্রী বলে মনে করা হয়। অধিকাংশ দেবী মন্দির সিংহবাহিনী দুর্গার পরন্তু তাঁর সবকটি নাম দেবী পার্বতীরই। ভোলানাথের সঙ্গে পার্বতীর আরোহনের জন্য বৃদ্ধ নন্দী ষাঁড়টি ছিল। হাজার সিংহ দ্বারা যোজিত রথে তিনি ভগবান শিবের সঙ্গে কখনও উপবেশন করেননি। একথাও উল্লেখযোগ্য যে, মহিষাসুরের লড়াই দেবতাদের সঙ্গে হয়েছিল, সামান্য মানুষের সঙ্গে নয়। সেটা দেবলোকের ঝগড়া ছিল, সমস্যা ছিল দেবলোকের। আপনাদের পৃথিবীতে এইরূপ কোন কান্ড হয়নি, আপনি কেন ব্যতিব্যস্ত হচ্ছেন? দুর্গা পূজা করার নামে পৃথিবীবাসী তাঁকে কি বিচার করে পূজা করে?

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন যে, একমাত্র পরমাত্মাকে ছাড়া কারও অস্তিত্ব নেই। একমাত্র পরমাত্মারই ভজনা করা উচিত। সেই পরমাত্মা জ্যোতির্ময়, কালাতীত, একে শস্ত্র ছেদন করতে পারে না, অগ্নি দগ্ধ করতে পারে না, বায়ু শুষ্ক করতে পারে না, আকাশ নিজের মধ্যে বিলীন করতে পারে না; প্রকৃতিজাত কোন পদার্থ তাকে স্পর্শ করতে পারে না। সেই পরমাত্মা শাশ্বত, সনাতন, সব স্থান থেকে দেখেন, শোনেন। আপনি সঙ্কল্প পরে করবেন, তিনি তা আগে থেকেই জানেন। সেই প্রভু নিবাস করেন আপনার অন্তরে। তিনি সকলের অন্তরে জীবনীশক্তিরূপে প্রবহমান। সেইজন্য ভজনা একমাত্র পরমাত্মার করা উচিত।

দ্বৌ ভূতসর্গৌ লোকেঽস্মিন্ দৈব আসুর এব চ।
দৈবো বিস্তরশঃ প্রোক্তং আসুরং পার্থ মে শৃণু।। (গীতা, ১৬/৬)

গীতার অনুসারে মানুষের স্বভাব দুই প্রকারের - দেব-স্বভাব ও অসুর স্বভাব। যাঁর হৃদয়ে দৈবী সম্পদ্ কাজ করে তখন এই মানুষই দেবতুল্য এবং যখন আসুরী সম্পদের বাহুল্য ঘটে তখন এই মানুষই অসুর হয়ে যায়। বাস্তবে এইলোকে ভূতগণের স্বভাব দু'প্রকারের - দেব-স্বভাব এবং অসুর স্বভাব। আপনার এক ভাই অসুর এবং আরেক ভাই দেবস্বভাবের হতে পারে। দৈবী সম্পদ পরমকল্যাণ করে। পরমাত্মার দেবত্ব অর্জন করতে-করতে চিত্তের নিরোধাবস্থাতে পরমতত্ত্ব পরমাত্মার দর্শন, স্পর্শ এবং তাঁতে স্থিতি লাভ হয়।

যতক্ষণ দৈবীসম্পদ (দেবতা) ছড়িয়ে আছে, ততক্ষণ দেহে মহিষাসুর কার্যরত থাকে। 'মহী'-এর অর্থ পৃথিবী। আসুরী সম্পদ প্রাপ্ত পুরুষ বলেন যে, ভগবান নামের কোন বস্তু নেই; এই জগতে যা কিছু দেখা যায়, সমস্তই স্ত্রী-পুরুষের সংযোগে উৎপন্ন হয়েছে আমিই ঈশ্বর এবং ঐশ্বর্যের ভোক্তা; আমার এত সম্পত্তি, ভবিষ্যতে আরও এত হবে; এই শত্রু শেষ হয়েছে, ঐ আর এক শত্রু সেও মারা যাবে; আমার একান্নবর্তী পরিবার, আমি ধনবান এবং এই পৃথিবীর রাজা - অন্তঃকরণের এই বৃত্তিকেই মহিষাসুর বলে। এটা আসুরী বৃত্তি। যতক্ষণ এই বৃত্তি থাকবে, ততক্ষণ তার সঙ্গে সহস্র, অনন্ত বৃত্তি থাকবে। এরাই রক্তবীজ। **'করতহুঁ সুকৃত ন পাপ সিরাহীঁ। রক্তবীজ জিমি বাঢ়ত জাহীঁ।।'**

একদিক থেকে পাপকর্ম বন্ধ হয় তো অন্যদিক থেকে আবার শুরু হয়। এটাই রক্তবীজের রহস্য। ভগবানের কৃপা এবং তাঁর প্রতি সমর্পণ থাকলেই এই আসুরী বৃত্তিগুলি শান্ত হয় আর অন্য কোন উপায় নেই।

সকলের অন্তঃকরণে আংশিকরূপে দৈবী ভাব থাকে। অসুরদের অত্যাচারে ব্যথিত হয়ে দেবগণ ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশের কাছে গিয়েছিলেন। তাঁরা দেবতাদের সংগঠিত করেছিলেন। দৈবী সম্পদ এককে পরিণত হয়েছিল। আপনার হৃদয়ে দৈবী সম্পদের সমূহই দেবী। যেমনই দৈবী সম্পদ বলশালী হয় তেমনই আসুরী সম্পদ শান্ত হয়ে যায়। দৈবী সম্পদ পূর্ণরূপে প্রকাশিত হলে আসুরী সম্পদ পূর্ণরূপে বিনষ্ট হয়, মহিষাসুর মারা যায়।

ভজনা আরম্ভ ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ দ্বারাই হয়। এই সৃষ্টি অনাদি, অন্তহীন। পৃথকভাবে কোন দেবী-দেবতাদের সৃষ্টির প্রয়োজন নেই। রচনা আপনার অন্তঃকরণে হয়। কোন তত্ত্বদর্শী মহাপুরুষের শরণ-সান্নিধ্যে তাঁর অল্প-বিস্তর সেবা, তাঁর নির্দেশ অনুসারে সাধনা করলে আপনার হৃদয়ে যে প্রভু প্রসুপ্ত, তিনি জেগে ওঠেন, ভগবান সঞ্চালক হয়ে যান, ওঠানো, বসানো, সাধনা সম্বন্ধে নির্দেশ দিতে থাকেন। জাগৃতির এই বিধিকে ব্রহ্মা বলে।

ভগবান শুরুতে তো শুধু নির্দেশ দেন, অভ্যাস কিছু উন্নত হলে পালন করতে শুরু করেন। যে শক্তি পালন করে তাকে বিষ্ণু বলে। বিশ্বের অণু থেকে বিষ্ণু! পরমাত্মা সর্বত্র অণুরূপে ব্যাপ্ত, যে অণুর উপর আপনি দাঁড়িয়ে, সেখান থেকেই যোগক্ষেম করতে শুরু করেন। অর্জুন এই স্তরেই ছিলেন। ভগবান বলেছিলেন - অর্জুন! কর্তা-বিধাতা তো

আমি, তুমি নিমিত্ত মাত্র হও। তাঁর সংরক্ষণে চলে অর্জুন যখন লক্ষ্যে পৌঁছেছিলেন তখন সেই পরমাত্মারই সংহারক শক্তি শিবকে দেখেছিলেন। শিব সাধককে সংহার করেন না পরন্তু আপনার জন্ম-মৃত্যুর কারণ যে সংস্কারসমূহ সেগুলি বিনাশ করেন। জন্ম-জন্মান্তর ধরে অর্জিত সংস্কারই হল দুঃখের কারণ। একটা মাত্র সংস্কারও আর একটা জন্মগ্রহণের হেতু হয়। অন্তিম সংস্কারও বিলুপ্ত হলে জন্মগ্রহণের হেতু সমাপ্ত হয়। সংস্কার বাকী থাকার জন্য হৃদয়-দেশ শ্মশানে পরিণত হয়। সেই সময় অন্তঃকরণে শুধু শিবতত্ত্ব, কল্যাণ তত্ত্ব, জ্যোতির্ময় তত্ত্ব, প্রকৃতির সীমার অতীত অসীম তত্ত্ব বাকী থাকে। ঈশ্বরের সকল বিভূতি সেই সাধকের মধ্যে বিদ্যমান থাকে। অজর, অমর, শাশ্বত ইত্যাদি ভগবানের যা কিছু ভগবত্তা আছে, সে সমস্তই প্রসারিত হয় - **'সুকৃতি সম্ভু তনু বিমল বিভূতি মঞ্জুল মঙ্গল মোদ প্রসূতী।'** ভগবান শিবের মধ্যে যা-যা বিভূতি আছে, তা লাভ হয় গুরু মহারাজের চরণ কমলের প্রতি ভক্তি উৎপন্ন হলে, কারণ গুরুমহারাজই সাধকের হৃদয়ে এই সমস্ত বিভূতি প্রবাহিত করেন। এই কাহিনীর মধ্যেও এই উল্লেখ করা হয়েছে। দেবগণ একত্র হলে বিধি জাগ্রত হয়, পালন হয়, সকল দৈবী সম্পদ একত্র হলে মহিষাসুরের সংহার হয়। কোন-কোন কাহিনীতে উল্লিখিত আছে যে, মহিষাসুরের মৃত্যুর পর তার ভগিনীও দেবলোককে আতঙ্কিত করেছিল। প্রাপ্তির পর কিছুদিন পর্যন্ত প্রাপ্তির নেশা থাকে যে, আমি ব্রহ্মা, আমি আত্মা-এটাই মহিষীর রূপ। একে হরিহর পুত্রই নাশ করতে পারে। হরি অর্থাৎ শুভাশুভের হরণকর্তা শক্তি এবং হর অর্থাৎ কল্যাণস্বরূপ শিব। শুভাশুভ সংস্কার বিলুপ্তির পর নারায়ণস্বরূপ শিবস্বরূপ জেগে ওঠার পর কে বলবে, 'আমি ব্রহ্ম'। পৃথক থাকলে তবেই তো বলবে!

তহাঁ ন ঈশ্বর জীব ন মায়া, পূজক পূজ্য ন চেরা।
কহে কবীর সুনো ভাই সাধো, নহিঁ তহঁ দ্বৈত বখেড়া।।

'আমি পূর্ণ' - এই বৃত্তিও সমাপ্ত হয় - **'কোই অপনে মে দেখা, সাইঁ সন্ত অতীত।'**

মহিষাসুরের কাহিনীও যৌগিক রূপক ব্যতীত অন্য কিছু নয়, মহিষাসুর নামের কোন রাক্ষস জন্মগ্রহণ করেনি, যাকে নাকি দেবী বধ করেছেন। সৃষ্টির শুরু থেকে স্ত্রীলোক রক্ষণীয়। তাঁদের রক্ষা করার দায়িত্ব পুরুষজাতির। কন্যাদের রক্ষা করার দায়িত্ব পিতার উপর, বোনেদের রক্ষা করার দায়িত্ব ভাইদের উপর, মাতাদের রক্ষা এবং সেবা করার দায়িত্ব পুত্রদের উপর বর্তায়। এইপ্রকার তাঁদের রক্ষা করার দায়িত্ব স্বজনদের উপর সদৈব ছিল। বহু মহিলা বীরাঙ্গনাও ছিলেন। নিজের এবং দেশ রক্ষা করার জন্য তাঁরা প্রাণ উৎসর্গও করেছেন, কিন্তু পরমাত্মার পরিবর্তে তাঁদের পূজা করা হয়েছে, এই প্রকার কোন উদাহরণ পাওয়া যায় না।

যেখানে-যেখানে দেবীর স্তুতি করা হয়েছে, সেসবই মন্দির প্রায় মাতা পার্বতীর; পরবর্তীকালে তাঁকে দুর্গা নাম দেওয়া হয়েছে। তাঁর আহার মহিষ, মেষ, পাঁঠা এইপ্রকার বলা হয়েছে। তিনি হিমাচল নরেশের কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, জ্ঞান হওয়ার পর তপস্যা করার জন্য গৃহত্যাগ করেছিলেন, তপস্যাকালে তাঁর নিরামিষাশী জীবনের উল্লেখ পাওয়া যায় -

কছু দিন ভোজন বারি বতাসা। কিয়ে কঠিন কছু দিন উপবাসা।।
বেল পাতি মহি পরই সুখাই। তিন সহস সম্বত সোই খাঈ।।

যখন তিনি ভগবান শিবের গৃহে কৈলাশ পর্বতে গিয়েছিলেন তখন কন্দ, মূল, ফল, সিদ্ধি, পেশা ভাং! এসবই গ্রহণ করেছেন। মাংস, মেষ - মহিষ কিছু খাননি। পিতৃগৃহেও মাংস সেবন করেননি, সুরাপান করেননি, পতিগৃহেও এসব গ্রহণ করেননি, যদিও শক্তিরূপে সমস্ত মূর্তি দেবী পার্বতীর তবুও সব স্থানে মেষ খাও, মহিষ খাও, পাঁঠা খাও। এসবই শিক্ষা এবং শাস্ত্রের অভাবে প্রচলিত কুরীতি ছাড়া আর কিছু নয়।

যোধপুর থেকে পঁয়ষট্টি কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে ওসিয়াতে চামুণ্ডা মাতার মন্দির আছে সেখানে ১০৮টি মহিষ এবং অসংখ্য পাঁঠা বলি দেওয়া হত। পরবর্তীকালে সেখানের শাসক এবং প্রজা জৈন-ধর্ম অবলম্বন করেছিল। জৈন ভক্তরা গুরুদেবকে জিজ্ঞাসা করেছিল যে, এখন দেবীর পূজা কিরূপে করি? গুরুদেব বলেছিলেন যে, আমাদের মুখ্য সিদ্ধান্ত হল অহিংসা, তা আমরা ত্যাগ করতে পারি না। দেবীকে মিষ্টি ভোগ অর্পণ করা হোক। এর ফলে দেবী রুষ্ট হয়েছিলেন। গুরুদেবকে বলেছিলেন যে, আমি তোমার ধর্মকে গতি প্রদান করেছি আর তুমি কিনা আমার পরম্পরাগত নিবেদনের বস্তু বন্ধ করিয়েছ। গুরুদেব তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, কি নিবেদন করব? চামুণ্ডাদেবী বলেছিলেন - করড়-মরড় চাই। গুরুদেব দেবীর আজ্ঞা অনুযায়ী শিষ্যদের আদেশ দিয়েছিলেন - তোমরা দেবীকে শুষ্ক নারকেল করড় এবং খাজা (মিষ্টান্ন বিশেষ) মরড় অর্পণ কর। দেবী আচার্যকে বলেছিলেন, আমি করড়-মরড় চেয়েছিলাম, তুমি অন্য পদার্থ নিবেদন করিয়েছ। একথা শুনে আচার্য দৃষ্টান্ত দিয়ে দেবীর ভিতর প্রতিবোধন ঘটিয়েছিলেন যার ফলে দেবীর জ্ঞানচক্ষু উন্মেষিত হয়েছিল। তিনি হিংসার পথ পরিত্যাগ করেছিলেন রৌদ্ররূপ ধারিণী চামুণ্ডা বাৎসল্যরূপে সচ্চিয়ায় মাতা নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন। যেখানে যে প্রকারের ভক্ত এবং পূজারী, সেখানে সেই প্রকারেরই নৈবেদ্য নিবেদন করা হয়।

জসোল রাজ্যের রাণী ভটিয়াণীজী মাঁ জী সা, মালাণা-এর রাণী সা, বাকল মাতা ইত্যাদি রাজপূতদের পূর্বপুরুষ ছিলেন। গণগৌর (ঘণগৌর)-এর রূপে মাতা পার্বতী এবং ঈশ্বর (শিব) এর পূজা কোথাও হোলীর পর কোথাও শ্রাবণী তীজ-এর উপলক্ষ্যে গোটা ভারতে হয়ে থাকে (যখন ভগবান শিব এবং পার্বতীর পূজা, রামনবমী এবং বিজয়াদশমী - এই সমস্ত উৎসব পূর্ব থেকেই নির্ধারিত তখন সেই উপলক্ষ্যে সেই-সেই তিথিগুলিতে দেবী-পূজা (এবং গণপতি পূজা) - এর নাম করে নতুন-নতুন পূজা শুরু করানো এবং এই পূজা না করলে পাপ হবে - মহাভাগবত (দেবী পুরাণ) - এর এইরূপ বলা বিকৃত মনোদশার পরিচায়ক, ঈশ্বরের অতুলনীয় পরাক্রম ধূমিল করার চেষ্টা মাত্র, সত্যকে মুছে ফেলার চেষ্টা। ভগবান মহাবীর এবং গৌতম বুদ্ধকে পূজা করা হয়। আপনি আপনার পূর্বপুরুষদের প্রণাম করে, এঁদের কাছ থেকে প্রেরণা গ্রহণ করুন, যা কিছু নিবেদন করেন, খাওয়া-দাওয়া করেন, সবকিছু করুন; পরন্তু ভজনা একমাত্র পরমাত্মার

করুন, যার আরাধনা আমার-আপনার সকলের পূর্বপুরুষগণ করেছেন। আপনি দেব-দেবীর মন্দিরে শ্রদ্ধাস্থানে, পূজাঘর, পগোড়া, আশ্রম, মসজিদ, চার্চ, গুরুদ্বারা প্রভৃতিতে নিজ-নিজ শ্রদ্ধানুসারে যেখানেই যান না কেন, সেখানে নিজের সুখ-দুঃখ সম্বন্ধে বলুন, তাঁদের কাছ থেকে আশীর্বাদ এবং প্রেরণা গ্রহণ করুন; তীর্থ-ব্রত পালন যাই করুন না কেন এতে দোষের কিছু নেই কিন্তু তাঁদের কাছে একমাত্র পরমাত্মার প্রতি ভক্তি যাতে স্থির হয়, তা কামনা করুন, অন্তরে সেই পরমাত্মাকে, শ্বাসে নামকে দেখার অভ্যাস করুন এই নির্দেশ আপনার আদিশাস্ত্র গীতাতে দেওয়া হয়েছে, গীতাশাস্ত্র যথাযথ অনুধাবন করার জন্য গীতার যথাবৎ ব্যাখ্যা 'যথার্থ গীতা' অধ্যয়ন মনন করুন।

এইরূপ যখন মাতা মীরা প্রথম শ্বশুরালয় গিয়েছিলেন তখন পরম্পরাগত ভাবে তাঁকে মাংস পাক করতে বলা হয়েছিল। মীরা বলেছিলেন - আমি মাংস রন্ধন করতে পারব না। শাশুড়িমা, ননদ সকলে বলে উঠেছিল - এটা ক্ষত্রিয়ের বাড়ি। এখানে ঢোল করতাল বাজে না, তলোয়ার চালনা করা হয়। এখানে মাংস না গ্রহণ করলে দুর্বল হয়ে যাবে। পুরোহিত মীরাকে বলেছিলেন - এটা দেবীর প্রসাদ। মীরা বলেছিলেন - পুরুত মশাই! দেবী তো মা, তাই না। তিনি জীবনদান দেন, কারও প্রাণ নিতে পারেন না। নিরুত্তর পুরোহিত ক্রোধ প্রদর্শিত করে বলেছিলেন - আমারই ভুল স্ত্রীলোকের সঙ্গে কথা বলা উচিত হয়নি। আজ থেকে পাঁচদিন পর্যন্ত আমি মৌনব্রত ধারণ করে থাকব। পুরোহিত মশাই সেখান থেকে চলে গিয়েছিলেন।

বস্তুতঃ ভারতে এমন কোন রাজপরিবার নেই যেখানে দেবীকে পূজা করা হয় না। দৈবাৎ কখনও সাধু-মহাত্মাই সেখানে গিয়ে ভগবানের চর্চা করতেন। ভারতবর্ষে ধর্ম যা মূলরূপে জীবিত, তা সাধু-সন্তদের চিন্তনধারাতে সুরক্ষিত রয়েছে। রাজস্থান এবং ভারতের অন্যান্য স্থানেও প্রত্যেক রাজবংশের দেবী আলাদা-আলাদা। রাজপুরুষগণ নিজেদের মধ্যেই যুদ্ধ করতেন। প্রত্যেকটি দেবী নিজের রাজাকে বিজয়ী করার জন্য অন্য রাজার সর্বনাশ পর্যন্ত করতেন এবং যখন সাকা অথবা জহরব্রত অবলম্বন করতেন রাজপুত রমণীগণ তখন কিন্তু এই প্রকারের কোন দেবীকে দেখা যায় না। সত্য তো এটাই যে, শাস্ত্রের অনুসারে ভগবানের পরিবর্তে নিজের পূজা করানো এবং ভগবানের থেকেও বেশী নিজের প্রভাব প্রদর্শনকারী কোন দেবী কখনও আবির্ভূতই হয়নি।

শুম্ভ-নিশুম্ভ

দেবী কর্তৃক শুম্ভ-নিশুম্ভ এবং তাদের সেনাপতিদের সংহার-এর কাহিনী দ্বারা লেখক প্রকৃতির অসারতা বোঝাবারই প্রয়াস করেছিলেন কিন্তু জনসাধারণ জীবন ধারণের জন্য বিভিন্ন মন্দির নির্মাণ করে সেখানে দেবীকে প্রতিষ্ঠা করে পূজা করা শুরু করেছে। এই কাহিনীতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মাতা পার্বতী হিমালয়ের গুহায় তপস্যা করতেন, গঙ্গা স্নান করতেন। শাস্ত্রে গঙ্গার দুটি রূপের উল্লেখ করা হয়েছে। একটি গঙ্গার উৎপত্তিস্থান গঙ্গোত্রী, দ্বিতীয়টি হল জ্ঞান গঙ্গা এতে অবগাহন করলে আপনি সদা সর্বদার জন্য পাপমুক্ত হবেন, পরম পবিত্র হয়ে যাবেন -

ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে।
তৎস্বয়ং যোগসংসিদ্ধঃ কালেনাত্মনি বিন্দতি।। (গীতা, ৪/৩৮)

অর্জুন! জ্ঞানের সমান পবিত্র এই সংসারে আর কিছু নেই! কোথায় লাভ হবে? **'তৎস্বয়ং যোগসংসিদ্ধঃ কালে'** - যোগের আরম্ভে নয়, মধ্যে নয়, পরিপক্ক অবস্থায়, পূর্ণত্বকালে **'আত্মনি বিন্দতি'** - হৃদয় ক্ষেত্রেই অনুভব করবে। সাক্ষাৎকার করে যে অনুভব হয়, তাকেই জ্ঞান বলে। সেই জ্ঞানগঙ্গাতে যিনি অবগাহন করেন, তিনি আর কখনও অপবিত্র হন না।

সেই সময় অসুররাজ শুম্ভ-নিশুম্ভের অত্যাচারে ইন্দ্র-এর সঙ্গে সকল দেবগণ সন্তপ্ত হয়ে উঠেছিলেন। দু'জন অসুরই অত্যন্ত সুপুরুষ ছিল। সৃষ্টিতে সকলের থেকে বেশী সুপুরুষ! এরা দু'জনেই পুষ্করে উগ্র তপস্যা করে ব্রহ্মার কাছ থেকে বর পেয়েছিল যে, দেবগণও এদের পরাস্ত করতে পারবে না। নিজেদের পরাক্রমের জোরে এরা ত্রিলোকে আতঙ্কের সৃষ্টি করেছিল। দেবগণ নিজেদের রক্ষা করার জন্য ব্রহ্মার কাছে এর উপায় কি জিজ্ঞাসা করেছিলেন। ব্রহ্মা তখন বলেছিলেন যে, পূর্বে মহিষাসুরের হাত থেকে দেবীই আপনাদের রক্ষা করেছিলেন। দেবী কথা দিয়েছিলেন যে, আপনারা যখনই ত্রাণ পাওয়ার জন্য তাঁর কাছে প্রার্থনা করবেন, তিনি আপনাদের সকলকে রক্ষা করবেন। এই পরামর্শের অনুসারে সকল দেবগণ একত্রে দেবীর স্তুতি গাইছিলেন।

পার্বতী স্নান করার উদ্যোগ করছিলেন, তিনি জিজ্ঞাসা করেছিলেন আপনি কার স্তুতি করছেন? পার্বতীর অন্তর্কোষ থেকে এক দেবী প্রকট হয়েছিল, সেই রূপ বলেছিল - এঁরা আমাদের স্তুতি করছেন। দেহের কোষ থেকে প্রকট হওয়ার জন্য কৌশিকী, শিবা, অম্বিকা প্রভৃতি নামে তাঁকে পরবর্তীকালে ডাকা হয়। এটি কোন দেবী ছিল না, পরন্তু পার্বতীর পঞ্চকোষ থেকে নির্মিত অন্তর্দৃষ্টি ছিল, তিনি প্রকৃতির বাস্তবিকতা সম্বন্ধে অবগত হয়েছিলেন। পার্বতীর মুখমণ্ডলে কালিমা দেখা গিয়েছিল। এই কালিমা ছিল প্রকৃতির যে, কাল কি এবং এর ক্ষমতা কতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত? তা জানতে পেরেছিলেন। কাল কৌশিকীর থেকে কালো ছিল। তার গঠনে উপাদান ছিল অস্থি, পঞ্জর, কঙ্কাল, রক্তবর্ণ চক্ষুদ্বয় যেন ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে, উদর পাতকুয়া (গর্ত) এর মত ছিল কালের মাধ্যমে সংসারের যে চক্র আবর্তিত হচ্ছিল, তাতে তার এই রূপেরই দর্শন হয়েছিল।

সেইসময় অসুররাজ শুম্ভ এবং নিশুম্ভ কৌশিকীকে আকর্ষিত করতে চেয়েছিল। তার সেনাপতি ধূম্রলোচন, চণ্ড-মুণ্ড, রক্তবীজ প্রভৃতিগণ শুম্ভের বৈভবের প্রলোভন দেখিয়েছিল। শুম্ভ অর্থাৎ সৃষ্টির সৌন্দর্য। নিশুম্ভ অর্থাৎ সত্য না হওয়া সত্ত্বেও যা সত্য বলে প্রতীত হয়। বাস্তবে তার কোন অস্তিত্ব নেই। শুম্ভের বৈভব-সৌন্দর্যের মধ্যে ছিল হাতী, ঘোড়া, প্রাসাদ ইত্যাদি সৃষ্টির সৌন্দর্য। সেই সৌন্দর্যের নশ্বরতা, এর কালিমার বীভৎস দৃশ্য কৌশিকীর সমক্ষে আসার পর তার এই বৈভবের প্রতি অরুচি উৎপন্ন হয়েছিল। এর তাৎপর্য হল কালী অসুরদের সেনা, সেনাপতি চণ্ড-মুণ্ড, রক্তবীজ প্রভৃতিকে হস্তী, অশ্ব, রথ সহ উদরস্থ করেছিলেন। যখন দেবী সংঘর্ষে প্রবৃত্ত হলেন তখন

সকল দেবগণের শক্তিও তাঁর শক্তির সঙ্গে মিলিত হয়েছিল। সকল দেবগণের অস্ত্রশস্ত্রও লাভ করেছিলেন। যখন সমস্ত দেবগণের দৈবী শক্তি মিলিত হয়েছিল তখন দৈবী সম্পদ জয়লাভ করেছিল, শুম্ভ এবং নিশুম্ভ-এর মৃত্যু হয়েছিল। কাহিনীর সারাংশ এটাই যে, অসুরদের দেবী বধ করেছিলেন। কাল-এর গতি সদা-সর্বদার জন্য রুদ্ধ হয়েছিল। দ্রষ্টা স্বীয় পরমাত্ম স্বরূপে স্থিত হয়েছিলেন। জগতরূপ রাত্রির সঞ্চালিকা, কালরাত্রিকে পরাজিত করা হয়েছিল। শনৈঃ-শনৈঃ উৎকর্ষ করতে করতে যখন দৈবী সম্পদ পূর্ণ হয়, কালের গতি সর্বদার জন্য শান্ত হয়, তখন কালী বিলীন হয়ে যায়, বাকী থাকে মহাগৌরী।

এরপর কালের কোন ভূমিকা থাকে না। সম্মুখে জ্যোতির্ময় পরমাত্মা এবং তাঁর বিভূতির দর্শন হয়। এরপর প্রকৃতি জন্ম, মৃত্যু দিতে পারে না - এই সংস্কার ছিন্ন হয়। জন্ম-মৃত্যুর অতীত পরম তত্ত্ব পরমাত্মা। তিনি সহজ প্রকাশ স্বরূপ। প্রকৃতির প্রভাব থেকে মুক্ত হলেই ঈশ্বরীয় বিভূতিগুলি ধারণ করার যোগ্যতা চলে আসে। শিবের দেহে এই বিভূতিগুলি বিরাজিত।

সুকৃত সম্ভু তন বিমল বিভূতী। মঞ্জুল মঙ্গল মোদ প্রসূতী।।

সেটাই হল শিবতত্ত্ব। '**কঃ পূজনীয়ং শিবতত্ত্বনিষ্ঠঃ।**' সৃষ্টিতে পূজনীয় কে? যিনি শিবতত্ত্বে স্থিত, সেই মহাপুরুষ। তিনি শঙ্কা হতে অতীত, সেইজন্য তাঁকে শঙ্কর বলা হয়। প্রেমই পার্বতী। প্রেমের দ্বারাই কালকে জয় করা সম্ভব। প্রেমের সঙ্গে চিন্তন এই পর্যায়ে পৌঁছালে কালের জন্যও এটা রাত্রি স্বরূপ। পার্বতী কালজয়ী হয়েছিলেন সেইজন্য কালরাত্রি! কালের পক্ষেও রাত্রিস্বরূপ। পার্বতীর কালজয়ী হওয়া এটা তাঁর আন্তরিক যোগ্যতা ছিল। এরপর কালের প্রভাব থাকে না। কালী স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে যায়, তার অস্তিত্ব শেষ হয়। জ্যোতির্ময় শিবতত্ত্ব বাকী থাকে, তাতে প্রতিষ্ঠিত হওয়া মাত্র তিনি সিদ্ধিদাত্রী হন। পরমতত্ত্ব পরমাত্মাতে একীভূত হওয়া সম্ভব হয়। স্বয়ং সিদ্ধিলাভ করলে অন্যকেও সিদ্ধি প্রদান করার ক্ষমতা চলে আসে। যতদূর সৃষ্টি প্রসারিত, মায়া ততদূর পর্যন্ত বিস্তৃত, কালের প্রভাব ততদূর পর্যন্ত থাকে। কালের দুটি স্বরূপ -

ম্যায় অরু মোর তোর ত্যাঁয় মায়া। জেহিঁ বস কীহ্নে জীব নিকায়া।।
তেহিঁ কর ভেদ সুনউ তুমহ সোউ। বিদ্যা অপর অবিদ্যা দোউ।।
এক দুষ্ট অতিসয় দুঃখ রূপা। জা বস জীব পরা ভবকূপা।।
এক রচই জগ গুন বস জাকেঁ। প্রভু প্রেরিত নহীঁ নিজ বল তাকেঁ।।
(মানস, ৩/১৪/-২-৬)

যখন সংসারের এইরূপের দর্শন হয় তখন তার কবল থেকে মুক্ত হওয়া সহজ হয়। সেই সময় অবিদ্যাও নাশ হয়। এই অবস্থাতে দৈবী সম্পদ অথবা বিদ্যার প্রয়োজনীয়তাও ফুরিয়ে যায়। তখন '**শুভাশুভ পরিত্যাগী ভক্তিমান্যঃ স মে প্রিয়ঃ।**' **(গীতা, ১২/১৭)** এই অবস্থাতে শুভাশুভ সকল কর্মফল ত্যাগ হয়। সংহারক প্রশক্তির নাম শিব। সংহারের পর হৃদয় ক্ষেত্র শ্মশানে পরিণত হয়। সংহারের পর বাকী থাকেন যিনি, তিনি হলেন পরমতত্ত্ব পরমাত্মা, জ্যোতির্ময় শিব! প্রকৃতির প্রভাব এখানে শেষ হয়ে যায়, এরপর সদা সর্বদার জন্য শান্ত হয়ে যায়। প্রকৃতির জিব বেরিয়ে যায়। সে বাম দিকেও যায় না, আবার ডান-

দিকেও যায় না। সে সন্মুখেও ধাবিত হয় না, পশ্চাৎপদও হয় না। সদা-সর্বদার জন্য বিলীন হয়ে যায়। কালিমা দূর হয়, স্বরূপ হয় মহাগৌরী। দেহের বর্ণ গৌর হলেও তাকে মহাগৌরী বলে না। দেহ তো বস্ত্র স্বরূপ - **'বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়'** - পুরাতন বস্ত্র পরিত্যাগ করে নতুন বস্ত্র পরিধান করা হয়। বস্ত্রের যে রং তাও ক্ষণিক। অন্তঃকরণ হয় গৌরবর্ণের। শুভাশুভ সংস্কার শেষ হলে আত্মদর্শন, স্পর্শ এবং স্থিতি লাভ হয়, যেখানে শুধু প্রকাশ আর প্রকাশ, সেই জ্যোতির্ময় ঈশ্বরীয় প্রকাশে স্থিতি লাভ হলে মহাগৌরী হওয়া সম্ভব হয়, এরপর সেখানে অবিদ্যার কালিমা আসে না, এবং বিদ্যার প্রকাশও আসে না, এই প্রকার অন্তঃকরণযুক্ত সাধক হন সহজ প্রকাশ স্বরূপ। মহাগৌরীর সঙ্গে-সঙ্গে পার্বতী নৈষ্ঠিকীম্ সিদ্ধি লাভ করেছেন। তিনি নিজে লাভ করেছেন এবং অপরকে প্রদান করার ক্ষমতা লাভ হওয়ার পর তিনি হয়েছেন সিদ্ধিদাত্রী!

এই বর্ণনা পার্বতীর অন্তঃকরণের উপলব্ধির, এই নয় যে, পার্বতী কালো অথবা গৌরবর্ণের হয়ে গিয়েছিলেন। আন্তরিক স্থিতি ব্যক্ত করার পদ্ধতি এটা, এই নয় যে, দেবী কালী শিবের হৃদয়ে পদস্থাপন করেছিলেন। সাধনার শুরুতে সকলের অন্তরে এই কালিমা থাকে, স্বরূপলাভের সঙ্গে প্রকৃতির অন্ধকার দূরীভূত হয় শুধু জ্যোতির্ময় রূপ থাকে পরে আর কখনও মলিন হয় না। এই সম্পূর্ণ কাহিনী ভগবৎ স্বরূপ লাভ করার চিত্রণ মাত্র।

নবদুর্গা ঃ নবরাত্রি পূজা

মহাভাগবত (দেবী পুরাণ) - এ দুর্গার ন'টি রূপ অথবা ন'জন দেবীর উল্লেখ করা হয়েছে যাঁদের পূজা নবরাত্রিতে ন'দিন ধরে করা হয়। দেবীপুরাণে উল্লিখিত আছে যে শারদীয় এবং বাসন্তিক নবরাত্রিতে দুর্গাপূজা করে না, সে পাপী। ব্যক্তি শৈব, বৈষ্ণব, শাক্ত, সূর্য অথবা গণেশ যাঁরই উপাসনা করুক না কেন সকলকে দেবীর নবরাত্রি ব্রত পালন করা উচিত এতে **'মহিষৈশ্ছাগ মেষকৈঃ (দেবী মহাভাগবত, ৪৬/২৩) 'মৎস্য মাংসাদ্দৈছাগ কাশর মেষকৈঃ' (৪৮/১৬)** - মৎস্য-মাংস ইত্যাদি পাঁঠা, কাশর অর্থাৎ মহিষ এবং মেষ অর্থাৎ ভেড়া উৎসর্গ করে আমার পূজা করা উচিত। নবরাত্রি-পূজা সম্পন্ন করার পরই ভগবান রাম রাবণকে পরাজিত করতে সমর্থ হয়েছিলেন, দশমী তিথিতে দেবীর মৃন্ময় প্রতিমা সমুদ্রে বিসর্জন করেছিলেন। এই প্রকার সকলকে নবরাত্রি ব্রত পালন করা উচিত।

ন'জন দেবীর নাম এই প্রকার - শৈলপুত্রী, ব্রহ্মচারিণী, চন্দ্রঘন্টা, কুষ্মাণ্ডা, স্কন্দমাতা, কাত্যায়নী, কালরাত্রি, মহাগৌরী এবং সিদ্ধিদাত্রী। বস্তুতঃ এঁরা পৃথক্-পৃথক্ ন'জন দেবী নন, পরন্তু দেবী পার্বতীরই বিভিন্ন সম্বোধন। যেমন - তিনি হিমাচল গৃহে জন্মগ্রহণ করেছিলেন সেইজন্য তাঁকে শৈলপুত্রী বলা হয়। তিনি ঘোর তপস্যা করেছিলেন, ব্রহ্মচর্য ব্রত পালন করেছিলেন সেইজন্য তাঁকে ব্রহ্মচারী বলা হয়। তিনি তপস্যা চন্দ্র মৌলি শিবকে লাভ করার জন্য করেছিলেন সেইজন্য তাঁকে চন্দ্রঘন্টা বলা হয়। এত উগ্র তপস্যা ছিল যে ব্রহ্মাণ্ডে তাঁর তপস্যা চর্চার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল সেইজন্য তাঁর আর এক নাম

কুষ্মান্ডা। ভগবান শিবের সঙ্গে বিবাহের পর তিনি পুত্রলাভ করেছিলেন সেই জন্য তাঁকে স্কন্দমাতা নামে ডাকা হয়। কর্ম করে তিনি লক্ষ্যে উপনীত হয়েছিলেন সেইজন্য তাঁকে কাত্যায়নী বলা হয়। দুর্ধর্ষ কালকেও গ্রাস করার ক্ষমতা ছিল সেইজন্য তাঁকে কালরাত্রি বলা হয়। প্রকৃতির কালিমা সমাপ্ত হয়েছিল সেইজন্য মহাগৌরী বলা হয়। ভগবানের রূপে স্থিতি লাভ করে পরমসিদ্ধি লাভ করেছিলেন এবং যে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাশীল, তাকেও সিদ্ধি লাভের প্রেরণা প্রদান করার জন্য সমর্থ হওয়ার ফলে তাঁকে সিদ্ধিদাত্রী বলা হয়। মাতা পার্বতীর এই নটি বিশেষ গুণ ছিল সেইজন্য তাঁকে এই সমস্ত নামে ডাকা হয়, এই নয় যে, এঁরা পৃথক্-পৃথক্ দেবী।

গোস্বামীজীও মাতা পার্বতীর বন্দনাতে লিখেছেন -

জয় জয় গিরিবররাজ কিসোরী। জয় মহেশ মুখ চন্দ চকোরী।।
জয় গজবদন ষড়ানন মাতা। জগত জননি দামিনি দুতি গাতা।।
(মানস, ১/২৩৪/৫-৬)

'জয় জয় গিরিবর রাজ কিসোরী' - গিরিরাজের কিশোরী। শিশু জন্মগ্রহণ করলে তাদের মাতা পিতার নাম ধরে ডাকা হয় যেমন অমুকের মেয়েকে ডাকো। বিবাহের পর **'জয় মহেস মুখ চন্দ চকোরী'** - যার সঙ্গে বিবাহ সম্পন্ন হয়েছে, তার মুখের প্রতি চকোরীর মত হয়ে যায়; সমাজ বলে অমুকের' স্ত্রীকে ডাকো। সন্তানের জননী হলে বলে - খুকুর মাকে ডাকো। বৃদ্ধা হওয়ার পর **'জগত জননি'** - তিনি সকলের মাতা হয়ে যান, **'দামিনি দুতি গাতা'** - গোটা জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়ে পরবর্তী প্রজন্মদের পথ সুগম করেন। ভারতীয় সংস্কৃতিতে মহিলাদের প্রতি এই আদর্শ সম্বোধন সদা সর্বদাই ছিল।

যেরূপ ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে অনেক নাম ধরে ডাকা হয় সেইরূপ মাতা পার্বতীরও নটি নাম। কৃষ্ণ শ্যামবর্ণের ছিলেন সেইজন্য তাঁকে কৃষ্ণ বলা হত। বর্তমানেও কোন শিশু শ্যামবর্ণের উৎপন্ন হলে তাকে কল্লু নাম ধরে ডাকা হয়। সেইকালে সংস্কৃত ভাষা প্রচলিত ছিল, সেইজন্য কৃষ্ণ নামকরণ করা হয়েছিল। শ্যামবর্ণের কন্যা উৎপন্ন হলে কৃষ্ণা নাম ধরে ডাকা হয়। কৃষ্ণ সম্বোধনটি এতই জনপ্রিয় ছিল যে, বর্তমানেও 'হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ' নাম বার-বার উচ্চারণ করা হয়। পরবর্তীকালে তিনি গোরু চরাতেন সেইজন্য তাঁকে আর এক নাম গোপাল বলে ডাকা হয়। কালিয়া নাগকে নাজেহাল করে তাকে দমন করার জন্য তাঁকে নাগনথৈয়া বলেও ডাকা হয়। গোবর্দ্ধন ধারণ করেছিলেন তাই গিরধারী। মুর নামক দৈত্যকে বধ করেছিলেন সেইজন্য মুরারী বলে ডাকা হয়। জরাসন্ধকে ভ্রমিত করে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে সরে পড়েছিলেন সেইজন্য রণছোড় নামে ডাকা হয়। দ্বারিকা গিয়ে বাস করেছিলেন সেইজন্য দ্বারিকাধীশ বলা হয়। এইরূপ অর্জুনেরও দশটি নাম ছিল। রাজকুমার উত্তর তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যদি আপনিই অর্জুন তবে নিজের দশটি নাম বলুন। অর্জুন বলেছিলেন। এইপ্রকার পার্বতীর দশটি নাম। এই নামকরণ কেউ করে না,

নবরাত্রি পূজার বিধানও শাক্ত মতাবলম্বীদের দ্বারা প্রচারিত আধুনিক পূজা পদ্ধতি মাত্র আর কিছু নয়। বস্তুতঃ ভারতবর্ষে শারদীয় নবরাত্রিতে বিজয়াদশমী এবং বাসন্তিক নবরাত্রি চৈত্র মাসের শুক্ল পক্ষের নবমী তিথিতে ভগবান রামের জন্মোৎসব পালন করা হয়। রাবণের দশটি মুণ্ড হরণ করা হয়েছিল সেইজন্য ইদানিং উত্তর ভারতে বিজয়া-দশমীকে বহু ব্যক্তি দশহরা বলে থাকে। যদ্যপি জৈষ্ঠ্য মাসের শুক্লপক্ষের দশমী তিথিতে দশহরা পালন করা হয় গঙ্গা স্নান, দানাদি করে। ব্রহ্মপুরাণে (৬৩/১৫) উল্লিখিত আছে যে, এই তিথি দশ প্রকারের পাপ হরণ করে সেইজন্য একে দশহরা বলা হয়। গঙ্গা যখন মর্তে অবতরিত হয়েছিলেন, সেই সময় জ্যোতির্বিদ্যা অনুসারে দশটি যোগ সম্মিলিত ছিল- জ্যৈষ্ঠ মাস, শুক্লপক্ষ, দশমী তিথি, মঙ্গলবার, হস্তা নক্ষত্র, ব্যতীপাত, গরকরণ, আনন্দযোগ, কন্যারাশিতে চন্দ্র এবং বৃষ রাশিতে সূর্য ছিলেন। শুরুতে এই পর্ব দশাশ্বমেধ ঘাটে গঙ্গা-স্নান, পূজা এবং দানের সঙ্গে সম্বন্ধীত ছিল; কিন্তু ধীরে-ধীরে এই পর্ব যে কোন নদীতে স্নান করে দান-ধ্যান করে পালন করা হয়।

আশ্বিন মাসের শুক্লা দশমী তিথিতে বিজয়াদশমী পালন করা হয়। এই দিনটিতে ভগবান রাম লঙ্কার রাজা রাবণকে পরাজিত করেছিলেন এরই স্মৃতিতে প্রতিপদ থেকে দশমী - এই দশদিন ধরে গোটা ভারতে এবং বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে রামলীলার আয়োজন করা হয় এবং দশমী তিথিতে রাবণের প্রতিমূর্তি দহন করা হয়।

ত্রেতা যুগে রাবণের অত্যাচারে মৃত্যুলোক থেকে শুরু করে দেবলোক পর্যন্ত সকল প্রাণী ত্রস্ত হয়ে উঠেছিল -

ভুজবল বিস্ব বস্য করি রাখেসি কোউ ন সুতন্ত্র।
মণ্ডলীক মণি রাবণ রাজ করই নিজ মন্ত্র।। (মানস, ১/১৮২ ক)

নিশাচরদের আতঙ্কে '**সুরপুর নিতহিঁ পরাবন হোঈ।**' - দেবলোকে নিত্যপ্রতি হুলস্থূল বেধে থাকতো। '**রাবণ আওত সুনেউ সকোহা। দেবহ্ন তকে মেরু গিরি খোহা।।**' - রাবণ আসছে ক্রুদ্ধ হয়ে, এটুকু শুনেই সকল দেবগণ মেরু পর্বতের গুহাগুলিতে গা ঢাকা দিয়েছিলেন। কিন্তু দেবীগণ আর কতদূর ছুটতেন? রাবণ তাঁদের পুষ্পক বিমানে অপহরণ করে লঙ্কা নিয়ে গিয়েছিল। দেবীদের অশ্রুতে পুষ্পকে ধারা প্রবাহিত হয়েছিল কিন্তু রাবণের মনে দয়ার উদ্রেক হয়নি। সে দেবীদের মুক্ত করেনি -

দেব জচ্ছ গন্ধর্ব নর কিন্নর নাগ কুমারি।
জীতি বরীঁ নিজ বাহু বল বহু সুন্দর বর নারি।। (১/১৮২/খ)

কয়েকজন দেবীকে নিজের সেবাতে নিযুক্ত করেছিল এবং বাকী যত দেবী ছিলেন তাঁদের সকলকে অসুরদের মধ্যে বিতরিত করেছিল। যখন দেবতাদের পরিবারকেই রাবণ বন্দী করেছিল, দেবীদের রাক্ষসদের সঙ্গে থাকতে বাধ্য করা হয়েছিল এই অবস্থাতে দেবতারা লুকিয়েই বা কি করতেন? তাঁরা দেবীদের মুক্ত করাবার উদ্দেশ্যে রাবণের নিকট গিয়েছিলেন। রাবণ তাঁদেরও নিজের সেবাতে নিযুক্ত করেছিল। অগ্নিদেব রুটি তৈরী করছিলেন, পবনদেব মৃদুমন্দ বায়ু প্রবাহিত করছিলেন, আবার কোন দেবতা হাত

জোড় করে আজ্ঞার প্রতিক্ষা করছিলেন। শনিশ্চরদেব বিরোধিতা করেছিলেন, তখন তাঁকে বেঁধে সিংহাসনের নীচে ক্ষেপন করা হয়েছিল। সিংহাসনে উপবেশন করার সময় রাবণ তাঁকে পদাঘাত করত এবং যখন সিংহাসন থেকে উঠে যেত তখনও পদাঘাত করত। দেব-দেবী ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। রাবণ ঋষিদের কাছ থেকেও খাজনা আদায় করত যে, আর কিছু নেই যদি তবে রক্তই দাও।

কিছু-কিছু লোক বলে যে, রাবণ ব্রাহ্মণ ছিল; কিন্তু বাস্তবে সে কোন জাতির অন্তর্গত ছিল না। ব্রাহ্মণদের শত্রু ছিল সে -

জেহিঁ জেহিঁ দেস ধেনু দ্বিজ পাবহিঁ।
নগর গাওঁ পুর আগি লগাবহিঁ।। (মানস, ১/১৮২/৬)

তেহি বহুবিধি ত্রাসই দেস নিকাসই জো কহ বেদ পুরানা।।
(মানস, ১/১৮২/ছন্দ)

বহুভাবে ভয় দেখাত যে ভগবানের গুনগান কেন কর? তা সত্ত্বেও কেউ অগ্রাহ্য করলে তাঁকে দেশ থেকে বিতাড়িত করেছিল। বিধাতার সমস্ত সৃষ্টিই তো তার অধিকারে ছিল, তার দেশ ছিল! এর বাইরে কোন্ দ্বীপে নির্বাসন দিত? বাস্তবে নির্বাসনের অর্থ ছিল মৃত্যুদণ্ড! কিছু কিছু নিশাচর নরখাদক ছিল - '**দুর্মুখ সুররিপু মনুজ অহারী।**' (মানস, ৬/৬১/১১) যেমন বর্তমানে কোন-কোন সাধু মহাত্মা কেবল দুধপান করে জীবনধারণ করে। কেউ কেউ ঘোল খেয়েই জীবনধারণ করেন সেইরূপ রাক্ষসদের মধ্যেও কেউ কেউ নরখাদক ছিল, যাঁদের নির্বাসন দেওয়া হত তাঁদের ভক্ষণ করত, তাদের আহারের ব্যবস্থা এইভাবে হয়ে যেত। পীড়িত সকলেই ব্রহ্মার নিকট গিয়েছিলেন -

সুর মুনি গন্ধর্বা মিল করি সর্বা গে বিরঞ্চি কে লোকা।
সঙ্গ গোতনুধারী ভূমি বিচারী পরম বিকল ভয় সোকা।।

ব্রহ্মাঁ সব জানা মন অনুমানা মোর কছূ ন বসাঈ।
জা করি তৈঁ দাসী সো অবিনাসী হমরেউ তোর সহাঈ।।
(মানস, ১/১৮৩, ছন্দ)

ব্রহ্মা বলে ফেলেছিলেন ঠিকই যে, পরমাত্মার শরণে যাও, কিন্তু শরণে যাওয়ার বিধি সম্বন্ধে বিধাতাও অবগত ছিলেন না। কেউ বৈকুন্ঠ যেতে বলছিলেন, কেউ বলছিলেন যে, ভগবান ক্ষীরসাগরে বাস করেন। এইপ্রকার সকলেই পরামর্শ দিচ্ছিল কিন্তু স্থির করতে পারছিলেন না যে,কোথায় গেলে তাঁর দর্শন পাবো -

তেহি সমাজ গিরিজা ম্যায় রহেউঁ। অবসর পাই বচন এক কহেউঁ।।
হরি ব্যাপক সর্বত্র সমানা। প্রেম তেঁ প্রগট হোহিঁ ম্যায় জানা।।
(মানস, ১/১৮২/৪-৫)

শিব বলেছিলেন ভগবান সর্বত্র বিদ্যমান, এখানেও তিনি আছেন। ভক্তি, প্রেমের মাধ্যমে তাঁকে লাভ করা যায়। এই বিষয়ে আমি অধ্যয়ন করিনি বা শ্রবণও করিনি, এ

আমি জানি। প্রেমপূর্ণ হৃদয়ে প্রার্থনা কর। সকলেই মিলে প্রার্থনা করেছিলেন, তিনি প্রার্থনা মঞ্জুরও করেছিলেন, আকাশবাণী হয়েছিল যে, আমি তোমার জন্য নর-বেশ ধারণ করব। কশ্যপ-অদিতি পূর্বজন্মে কঠোর তপস্যা করেছিলেন, তাঁরা বর্তমানে অযোধ্যা নরেশ দশরথ এবং কৌশল্যারূপে জন্মগ্রহণ করেছেন, আমি তাঁদের গৃহে তাঁদের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করব।

সৃষ্টির সমস্ত জীব, সকল মহাপুরুষ, দেবতা, বিপ্র, মানব, সকলেই অপেক্ষারত ছিল। প্রভুর জন্মের সময় আগত প্রায় হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে সকলে আনন্দে মেতে উঠেছিল, আগে দেবগণ আনন্দে মেতে উঠেছিলেন, তারপর অবধবাসীরা আনন্দ করতে শুরু করেছিল, যা ধারাবাহিকভাবে চলে আসছে -

জন্ম মহোৎসব রচহিঁ সুজানা। করহিঁ রাম কল কীরতি গানা।।

(মানস, ১/৩৩/৮)

যারা যারা প্রতিক্ষারত ছিল, সকলে উৎসবে অংশগ্রহণ করেছিল। এই উৎসব মাসের পর মাস ধরে পালন করে হয়েছিল - **'মাস দিবস কর দিবস ভা মরম ন জানই কোই।' (মানস, ১/১৯৫)** সূর্য সেখানেই স্থির হয়ে গিয়েছিলেন, প্রকাশের ব্যবস্থা স্বতই হয়ে গিয়েছিল, সকলেই আনন্দে মেতে উঠেছিল। কাগভুশুণ্ডিজী, শিব ভাববিভোর হয়ে অযোধ্যার অলিগলিতে ইতস্ততঃ সর্বত্র ভ্রমণ করছিলেন। এখানে কোন দেবীর উৎসবের উল্লেখ করা হয়নি। লক্ষ-লক্ষ বছর ধরে যে অত্যাচার হচ্ছিল এর ত্রাণকারী এবং রক্ষক ভগবানের অপেক্ষাতে জনসাধারণ দাঁড়িয়েছিল। এইপ্রকার বাসন্তিক নবরাত্রিতে রামনবমী উপলক্ষ্যে কয়েকদিন পর্যন্ত রামের প্রাদুর্ভাবের উৎসব পালন করা হয়, কোন দেবীর নামে উৎসব পালন করা হয় না।

এইপ্রকার যখন রাবণ বধের মুহূর্তটি উপস্থিত হয়েছিল তখন দেবতা, মহর্ষি, মনুষ্য-সকলেই মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে চতুর্দিক থেকে দেখে দেখে 'জয় হোক-জয় হোক' বলে যাচ্ছিলেন। মুণ্ডু কাটা গেলেও রাবণের মৃত্যু হচ্ছিল না -

জিমি জিমি প্রভু হর তাসু সির তিমি তিমি হোহিঁ অপার।
সেবত বিষয় বিবর্ধ জিমি, নিত নিত নূতন মার।। (মানস, ৬/৯২)

বিষয় সেবন করলে বিষয়ভোগ করার প্রবৃত্তি তীব্র হয়। কিছু-কিছু মহাত্মা গৃহের প্রতি আসক্তি ত্যাগ করে সাধু হন কিন্তু নিজের সাধন কুটীরের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়েন। কুটীরের প্রতি মোহ ত্যাগ করলেন তো ছড়িটির প্রতি আসক্তি হয়ে পড়লেন, ছড়ি থেকে কমণ্ডুলুর প্রতি আসক্ত হয়ে পড়লেন। ভজনা বাদ দিয়ে যেদিকে দৃষ্টি যায় তা মোহ। এটাই হল রাবণের কাটা মুণ্ডু জুড়ে যাওয়ার অর্থ। এখানেই **'নাভিকুণ্ড পিয়ুষ বস যাকেঁ।'** (৬/১০১/৫) - নাভি অর্থাৎ কেন্দ্র! এখানেই সংস্কার সংগৃহীত হয়, এখানেই আত্মিক সঞ্চার মোহ দ্বারা আবৃত রয়েছে। পরাবাণী বাণস্বরূপ। যখন চিন্তন পরাবাণীর স্তরে পৌঁছায় তখন রামের বাণে বিদ্ধ হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে আত্মিক সঞ্চার যা মোহের জন্য ক্ষীয়মাণ রামের শরণাগত হয়। মোহ ধরাশায়ী হয়। এরপর রাবণ আর কখনও জয়লাভ

করতে পারে না। মোহ সমাপ্ত হলেই মুণ্ডু বৃদ্ধি থেমে যাবে। তখনই দশানন মারা যাবে। এই বিজয়াদশমী গোটা সৃষ্টি পালন করেছিল এবং যখন রামের রাজ্যাভিষেক হয়েছিল তখন লক্ষ্মীর যে ঐশ্বর্য ছড়িয়ে ছিল, সব অবধে এসে জুটেছিল -

রামরাজ বৈঁঠে ত্রৈলোকা। হরষিত ভয়ে গয়েউ সব সোকা।
(মানস, ৭/১৯/৭)

নহিঁ দরিদ্র কোউ দুখী ন দীনা। নহিঁ কোউ অবুধ ন লচ্ছন হীনা।।
(মানস, ৭/২০/৬)

রামরাজ্যে কোন অভাব ছিল না। কাগভুশুণ্ডি মশাই বলছেন -

জব তে রাম প্রতাপ খগেসা। উদিত ভয়উ অতি প্রবল দিনেসা।।
পূরি প্রকাস রহেউ তিহুঁ লোকা। বহুতেহ্ন সুখ বহুতন মন সোকা।।
জিহ্নহি সোক তে কহউঁ বখানী। প্রথম অবিদ্যা নিসা নসানী।।
অঘ উলূক জহঁ তহাঁ লুকানে। কাম ক্রোধ কৈরব সকুচানে।।
বিবিধ কর্ম গুণ কাল সুভাউ। এ চকোর সুখ লহহিঁ ন কাউ।।
মৎসর মান মোহ মদ চোরা। ইহ্ন কর হুনর ন কবনিহুঁ ওরা।।
ধরম তড়াগ গ্যান বিগ্যানা। এ পঙ্কজ বিকসে বিধি নানা।।
সুখ সন্তোষ বিরাগ বিবেকা। বিগত সোক এ কোক অনেকা।।
(মানস, ৭/৩০/১-৮)

হে গরুড়! ধর্মের সরোবরে, পরম ধর্ম পরমাত্মা, তাঁর চিন্তন করার ফলস্বরূপ কর্মের যা প্রবৃত্তি ছিল - বিবেক, বৈরাগ্য, সংযম, দমন ইত্যাদি - এই সমস্ত পদ্ম প্রস্ফুটিত হয়েছিল। কোন সরোবর? ধর্মের সরোবর! একমাত্র ঈশ্বরকে ধারণ করাই ধর্ম, এর ফলে যে জ্ঞানলাভ হয় অর্থাৎ পরমাত্মাকে দর্শন করার সঙ্গে-সঙ্গে যে জ্ঞান লাভ হয় এবং জ্ঞানলাভ করার পরই ভগবানের নিকট যে প্রমাণ পাওয়া যায়, সেই বিজ্ঞান বেতারের তার, সেই পদ্ম **'বিকসে বিধি নানা'** - বিকশিত হয়েছিল, অবিদ্যারূপ রাত্রি সমাপ্ত হয়েছিল। সেই রাত্রিতে বিচরণকারী সমস্ত জীব সমাপ্ত হয়েছিল। এই প্রতাপ-রবি কোথায় উদিত হয়েছিল? **'ইয়হ প্রতাপ রবি জাকে, উর জব করহিঁ প্রকাস।' (মানস, ৭/৩১)** - এই প্রতাপরূপী সূর্য হৃদয়ে প্রকাশিত হয়। কাগভুশুণ্ডি মশাই বলেছিলেন -

রাম ভগতি চিন্তামণি সুন্দর। বসহিঁ গরুড় জাকে উর অন্তর।।
পরম প্রকাস রূপ দিন রাতী। নহিঁ কছু চহিঅ দিয়া ঘৃত বাতী।।
(মানস, ৭/১১৯/২-৩)

রামরাজ্যে প্রত্যেকটি গৃহে এই মণিদীপ জ্বলছিল -

মনি দীপ রাজহিঁ ভবন ভ্রাজহিঁ বিদ্রুম রচী। (মানস, ৭/২৬ ছন্দ)

এই প্রকার যখন রাবণ নিহত হয় তখন শ্রীরামের বিজয়ী হওয়ার উৎসব সকলেই পালন করেছিল। তাঁর রাজ্যাভিষেক হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে ত্রিলোক শোকমুক্ত হয়েছিল। লক্ষ-লক্ষ বছর ধরে দুঃখের যা কারণ ছিল, সেই দুঃখ থেকে অব্যাহতি পাওয়া গিয়েছিল। অন্ধকার দূর হয়েছিল। যে দেবগণ দিবারাত্রি গিরি কন্দরে লুকিয়ে বেড়াতেন, তাঁদের ভয় দূর হয়েছিল, তাঁদের সন্তান-সন্ততি সুরক্ষিত হয়েছিল। মোক্ষের পথ প্রশস্ত হয়েছিল। এই প্রকার বিজয়া দশমীর উৎসবও রামের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত, কোন দেবীর সঙ্গে নয়। দেবতা এবং দেবীগণ রাবণের শাসনকালে দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। তবে কেউ কেন তাঁদের পূজা করবে। ভবিষ্যোতর পুরাণে দেওয়ালী উৎসবও ভগবান রামের বিজয়ী হওয়ার উপলক্ষ্যে পালন করার উল্লেখ করা হয়েছে। এই পুরাণে একটি শ্লোক দ্বিবিধ অর্থ বহন করে -

উপশমিত মেঘনাদং প্রজ্বলিত দশাননং রমিত রামম্।
রামায়ণমিব সুভগং দীপদিনং হরতু বো দুরিতম্।। (১৪০/৭১)

একথা স্পষ্ট যে চৈত্রমাসে ভগবান রামের জন্মোৎসব এবং আশ্বিন মাসে শ্রীরামের বিজয়োৎসব পালন করার ধারা চলে আসছে। নবরাত্রিতে দুর্গা-পূজার উল্লেখ কোন প্রাচীন বৈদিক গ্রন্থে পাওয়া যায় না।

ভগবান শিবের মর্যাদার হনন

মহাভাগবত (দেবী পুরাণ) -এ উল্লিখিত আছে যে, ভগবান শিব সম্পূর্ণ প্রকৃতিকে স্ত্রীরূপে লাভ করার জন্য কঠোর তপস্যা করেছিলেন। (রামায়ণে এইরূপ উল্লেখ করা হয়েছে যে, শিবকে পতিরূপে লাভ করার জন্য পার্বতী তপস্যা করেছিলেন, এখানে এর বিপরীত লেখা আছে।) শিবকে এইরূপ তপস্যারত দেখে ব্রহ্মা এবং বিষ্ণুও তপস্যা করতে শুরু করেছিলেন। তাঁদের ইচ্ছা পূরণ করার জন্য দেবী বিরাট রূপ ধারণ করে সম্মুখে প্রকট হয়েছিলেন তখন ব্রহ্মা বিচলিত হয়ে চতুর্দিকে চেয়ে দেখেছিলেন, এর ফলে তাঁর চারটি মুখ হয়ে গিয়েছিল। বিষ্ণু ভীত হয়ে সাগরে লুকিয়ে পড়েছিলেন। শুধু শিব বসেছিলেন। দেবী তাঁর উপর প্রসন্ন হয়ে বলেছিলেন, দক্ষের গৃহে আমি কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করব তখন আমি অর্থাৎ প্রকৃতি আপনাকে পতিরূপে বরণ করব। শিবকে বিবাহ করে সতী পতিগৃহে গমন করেছিলেন। একবার দক্ষ যজ্ঞের আয়োজন করেছিলেন তিনি সেখানে শিবকে নিমন্ত্রণ করেননি কিন্তু সতী দক্ষের যজ্ঞে যাবার জন্য জিদ করেছিলেন। শিব তাঁকে অনেকভাবে বুঝিয়েছিলেন। সতী নিজের জিদে অনড় ছিলেন তিনি শিবকে নিজের বিরাট রূপ দর্শন করিয়েছিলেন যা দর্শন করে শিব ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলেন এবং এদিকে ওদিকে যেদিকেই যাচ্ছিলেন সেখানেই দেবীকে দর্শন করছিলেন তখন একস্থানে উপবেশন করে দু'চক্ষু বন্ধ করেছিলেন (রামচরিত মানসে উল্লেখ করা হয়েছে যে, রামকে পরীক্ষা করার সময় সতী প্রত্যেক দিশাতে রামকে দেখতে পেয়েছিলেন, তখন তিনি চক্ষু বুজে বসে পড়েছিলেন। এখানেই সেই কাহিনীটিকেই প্রস্তুত করা হয়েছে শুধু পাত্রগুলির ক্ষমতা পরিবর্তন করে)। অতঃপর সতীকে তিনি বলেছিলেন যে, নিজের স্ত্রী

ভেবে আমি আপনাকে আদেশ করার অপরাধ করে ফেলেছি, আমাকে ক্ষমা করবেন। আপনার যেমন ইচ্ছা, তেমন আপনি করুন। শিব পিতৃগৃহে যাওয়ার অনুমতি প্রদান করেছিলেন।

দেবীপুরাণে উল্লিখিত আছে যে, যজ্ঞে উপস্থিত কন্যাকে মাতা আদর, আপ্যায়ন করেছিলেন এবং বলেছিলেন হে মাতা! আমার ভাগ্য ভাল যে, আপনি যজ্ঞে উপস্থিত হয়েছেন কিন্তু আপনার মূর্খ পিতা শিবকে অপমান করেছেন, তাঁর মহিমা সম্বন্ধে অবগত নন। যজ্ঞস্থলে শিবের জন্য আসন দেখতে না পেয়ে সতী ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছিলেন তিনি নিজের ছায়াশরীর থেকে তাঁর একটি প্রতিকৃতি নির্মাণ করে অন্তর্ধান হয়েছিলেন। সেই ছায়া শরীরকে দক্ষ ভাল মন্দ কথা শুনিয়েছিলেন এবং ছায়া সতীই যজ্ঞকুন্ডে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন তিনি যজ্ঞকুন্ডে ঝাঁপ দেওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে যজ্ঞাগ্নি নির্বাপিত হয়েছিল।

এই পুরাণে উল্লিখিত আছে যে, সতীর বিয়োগে শিব দুঃখ পেয়েছিলেন। শিব যখন সতীর দগ্ধ দেহের ভস্ম নিজের দেহে লেপন করেছিলেন তখন কামাগ্নিতে খুবই পীড়িত হয়েছিলেন এবং এই পীড়িত অবস্থাতেই তিনি যমুনা নদীতে ঝাঁপ দিয়েছিলেন। তাঁর তাপে যমুনার জল শ্যামবর্ণের হয়ে গিয়েছিল। শিব দেবীর নিকট বহুভাবে প্রার্থনা করেছিলেন, তখন দেবী তাঁকে বলেছিলেন যজ্ঞে দগ্ধ আমার ছায়া শরীরকে প্রণাম করে মস্তকে ধারণ করে আপনি ভ্রমণ করুন। যেখানে-যেখানে আমার দেহের অংশ পতিত হবে, সেখানে-সেখানে শক্তিপীঠ স্থাপনা করা হবে। কামাখ্যা পীঠে তপস্যা করে আপনি আমাকে লাভ করবেন। শিব সতীর ছায়া শরীর তুলে নিয়েছিলেন এবং প্রসন্নভাবে পৃথিবীতে নৃত্য করতে শুরু করেছিলেন। ভগবান বিষ্ণু সুদর্শন চক্রের সাহায্যে শবটিতে খণ্ড খণ্ড করে দিয়েছিলেন এর ফলে শিব বিষ্ণুকে শাপ দিয়েছিলেন যে, তোমাকেও পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করতে হবে। তুমি যেরূপ সতীর ছায়াশরীর থেকে আমাকে পৃথক্ করেছ, সেইরূপ রাবণও তোমার স্ত্রীর ছায়াশরীর হরণ করবে এবং তোমাকে বিয়োগী করবে। শিব কামরূপে ছায়াদেবীকে লাভ করার জন্য তপস্যা করেছিলেন। তখন দেবী বলেছিলেন যে, আপনি ছায়া এবং আমার রূপ লাভ করার জন্য তপস্যা করেছেন সেইজন্য আমি গঙ্গা এবং পার্বতী দুটি রূপে আপনার স্ত্রী হব। ছায়া শরীর আপনি মস্তকে ধারণ করেছিলেন সেইজন্য গঙ্গারূপে আমি আপনার মস্তকে বিরাজ করব এবং পার্বতী রূপে আপনার গৃহের দেখাশুনা করব।

দেবী যখন হিমালয় গৃহে মৈনার গর্ভ থেকে উৎপন্ন হয়েছিলেন তখন হিমালয় দেবীকে প্রণাম করেছিলেন এবং ব্রহ্ম বিদ্যা প্রদান করার অনুরোধ তাঁর কাছে করেছিলেন। পার্বতী পিতাকে ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ দিয়েছিলেন যা দেবী গীতা অথবা ভগবতী গীতা নামে প্রচারিত। এই দেবী গীতাতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, শিশু কিরূপে জন্মগ্রহণ করে এবং এই শাস্ত্রকে ব্রহ্মবিদ্যা শাস্ত্র, উপনিষদ! যোগশাস্ত্র বলা হয়েছে। যেমন গীতাশাস্ত্রের অনুকরণ করা হয়েছে -

ইতি শ্রী মহাভাগবতে মহাপুরাণে শ্রীভগবতী গীতাসূপনিসৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগ-

শাস্ত্রে শ্রীপার্বতী হিমালয় সংবাদে ব্রহ্ম যোগোপদেশবর্ণন নাম সপ্তদশোহধ্যায়ঃ।

ভগবতী গীতার শ্লোকগুলি লক্ষ্য করুন - 'মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ্যততি সিদ্ধয়ে। তেষামপি সহস্রেষু কেচিৎ মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ।।' এই প্রকার 'অপি চেৎসুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্....'-এরও উল্লেখ দেবী গীতাতে করা হয়েছে। এইপ্রকার 'মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু। মৎপরঃ মামেবৈষ্যসি সংসার দুঃখৈর্নৈবহি বাধ্যসে।।' এই প্রকার গীতার শ্লোকগুলিতে কিছু কিছু শব্দ সংযোজন করে ভগবতী গীতার রচনা করে জনসাধারণকে ভ্রান্ত এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বাণী আদিশাস্ত্র গীতাকে বিকৃত করার প্রয়াস করা হয়েছে।

দেবী পুরাণে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে যে, নিজের পিতা হিমালয়কে উপদেশ দান করে ভগবতী দুর্গা পুনরায় শিশুরূপ ধারণ করে মাতৃদুগ্ধ পানে রত হয়েছিলেন। শিব তাঁকে লাভ করার জন্য হিমালয়ে তপস্যারত হয়েছিলেন। কামদেবের দেহের ভস্ম সর্বাঙ্গে লেপন করে মনে দেবীর ধ্যান করতে-করতে তিন হাজার বছর ধরে হিমালয়ে শিব তপস্যা করেছিলেন এবং সপ্তর্ষিগণকে আগ্রহ করেছিলেন (কোথাও লিপিবদ্ধ আছে যে, সতীর দেহের ভস্ম শিব নিজ অঙ্গে লেপন করে যমুনাতে ঝাঁপ দিয়েছিলেন; এখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, কামদেবের দেহের ভস্ম দেহে লেপন করেছিলেন। যেখানে যা মনে এসেছে তা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।)

দেবী পুরাণে উল্লিখিত আছে যে, শিব সপ্তর্ষিগণকে বলেছিলেন যে, হে মহামুনিগণ! যখন আমি প্রাণবল্লভা পার্বতীকে লাভ করে নেব তখন সেই দেবীর সর্বপ্রকারে নিরন্তর সেবা করব। সেই দেবী যেখানেই গমন করবেন, আমিও সেখানে গমন করব। কখনও ক্ষণমাত্রের জন্যও তাঁকে একা ছাড়ব না। যা তাঁর মনঃপূত নয় সেই কাজ আমি কখনও করব না। এখন আপনারা যান, আমি এই কাননেই গিরিরাজ কুমারীর ধ্যানে রত হব। এইপ্রকার ভগবান শিব পার্বতীকে লাভ করার জন্য তপস্যা করতে শুরু করেছিলেন।

এরই মাঝে তারকাসুরের অত্যাচারে ত্রস্ত দেবগণ শিবের সমাধি ভঙ্গ করার জন্য কামদেবকে শিবের কাছে প্রেরণ করেছিলেন। শিব কামদেবকে ভস্ম করেছিলেন এবং এরপরই পার্বতী শিবকে দর্শন দিয়েছিলেন। দেবী দক্ষ যজ্ঞে যেরূপ ধারণ করেছিলেন শিব সেইরূপ দর্শন করাবার প্রার্থনা জানিয়েছিলেন। যখন দেবী সেইরূপ ধারণ করেছিলেন তখন শিব ভূমিতে শয়ন করেছিলেন এবং তাঁর চরণ-কমল নিজের হৃদয়ে ধারণ করেছিলেন এবং এক সহস্র নামের মাধ্যমে তাঁর স্তুতি করেছিলেন।

শক্তিপীঠগুলির স্থাপনা করে নারী অঙ্গগুলির বর্ণনা, ভগবতী গীতাতে শিশুদের জন্মের বর্ণনা, বিবাহের পর শিব-পার্বতীর বিহারের বর্ণনা এত অশ্লীল যে, তা শ্রবণযোগ্য নয়, কহতব্য নয়। ভগবান শিবের কামজয়ী রূপকে বিকৃতরূপে প্রস্তুত করা মর্যাদাপূর্ণ নয়।

এই গ্রন্থে এও উল্লিখিত রয়েছে যে, শিব বলেছেন যে, হে দেবী! আপনার চরণ

কমলের রেণু মস্তকে ধারণ করার প্রযত্ন আমি করেছি এর কতকগুলি কণা গঙ্গাতে পতিত হয়েছিল এবং এর ফলে গঙ্গা মুক্তিদাত্রী হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছে অর্থাৎ প্রভাব গঙ্গার নয়, ভগবতীর চরণরেণুর প্রভাব এটা। পুরাণে উল্লিখিত আছে যে, দেবীকে ভক্তি করার ফলেই ভগবান শিব কালকুট বিষপান করতে সক্ষম হয়েছিলেন। ভগবান শিব একবার ভগবতীর রূপ দর্শন করেছিলেন তখন তাঁর স্ত্রীরূপে অবতরণ করার ইচ্ছা হয়েছিল। তিনি দেবীর কাছে প্রার্থনা জানিয়েছিলেন, তারপর তিনি রাধারূপে অবতরিত হয়েছিলেন। এক গোপবালক রাধার সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন করার চেষ্টা করেছিল কিন্তু ভগবান শিব অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন ফলে সেই গোপবালক হঠাৎ নপুংসক হয়ে গিয়েছিল। এই প্রকার যখন কার্তিকেয় তারকাসুরকে বধ করেছিলেন এবং পার্বতীর কোলে গিয়ে বসেছিলেন তখন বিষ্ণুর মনে ইচ্ছা জেগেছিল যে আমিও দেবীর কোলে বসে স্তনপান করি। দেবী তাঁর মনের ইচ্ছা জানতে পেরেছিলেন এবং বলেছিলেন - বিষ্ণু ! আপনার ইচ্ছা পূর্ণ হবে। যখন দেবী গণেশকে তৈরী করে তাঁকে জীবন দান দিয়েছিলেন তখন বিষ্ণু রূপী গণেশ তাঁর কোলে বসে তাঁর স্তনপান করতে শুরু করেছিলেন। এই প্রকার বিষ্ণু ইত্যাদি সকল দেব-দেবী ভগবতী দেবীরই আজ্ঞানুবর্তী। এই গ্রন্থেই অন্যত্র উল্লেখ করা হয়েছে যে, বিষ্ণু দেবীরই আরাধনা করে দৈত্যদের সংহার করতে সক্ষম হন। এই প্রকার শিবের ন্যায় বিষ্ণুকেও দেবীপূজকগণ দ্বারা অবজ্ঞা করা হয়েছে।

ভগবান রামের অস্তিত্ব বিলোপ

মহাভাগবত (দেবী পুরাণ)-এ উল্লিখিত আছে যে, ব্রহ্মা প্রভৃতির প্রার্থনা শুনে বিষ্ণু বলেছিলেন যে, রাবণের সঙ্গে যুদ্ধ করতে আমি অসমর্থ, আমার পক্ষে যুদ্ধে জয়লাভ করা সম্ভব নয় তা সত্ত্বেও যদি জগদম্বা কৃপা করেন তবে আমি রাবণকে যুদ্ধে হারাতে পারি। কিন্তু যদি রাবণও দেবীর আরাধনা করে তবে তার পরাক্রম বৃদ্ধি পাবে, তখন সেই পরাক্রমীকে আমি কিরূপে বধ করব? ব্রহ্মা রামকে বলেছিলেন - নরোত্তম! সীতা মন্দোদরীর গর্ভ থেকে উৎপন্ন হয়েছিল সেইজন্য সে তার কন্যা। রাবণ তাকেই অপহরণ করে লঙ্কা নিয়ে গেছে সেইজন্য লঙ্কার বিনাশ অবশ্যম্ভাবী।

এইরূপ পাপীদের ভবানী অবশ্য বিনাশ করবেন, আপনি চিন্তা করবেন না। রাম ভগবতীর স্তুতি করেছিলেন তখন আকাশবাণী হয়েছিল যে রঘু শ্রেষ্ঠ। আপনি ভীত হবেন না। ব্রহ্মা বেলবৃক্ষ মূলে আপনার বিজয়লাভ কামনায় নবরাত্রিতে আমার পূজা সম্পন্ন করেছেন। সেইজন্য আপনি শীঘ্রই রাক্ষসদের বধ করে লঙ্কা বিজয়ী হবেন। দেবীকে প্রণাম করে রাম যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। দেবী রামকে বলেছিলেন যে, যুদ্ধে জয়লাভ করার জন্য আপনি নিরন্তর আমাকে স্মরণ করবেন। বানরদের দিয়ে পূজার সামগ্রী আনিয়ে ভগবান রাম দেবীর পূজা সম্পন্ন করতেন। তাঁর পূজাতে সন্তুষ্ট দেবী রামের ধনুকে প্রবেশ করেছিলেন, রামের বাণের উপর উপবেশন করেছিলেন তবেই রাবণকে বধ করা সম্ভব হয়েছিল। এইপ্রকার পরাক্রম রামের ছিল না, দেবীর পরাক্রম ছিল।

এইপ্রকার মহাভাগবত (দেবী পুরাণ) এর অনুসারে ভগবান রাম যখন-যখন সঙ্কট থেকে বিচলিত হয়েছিলেন (সমুদ্রে সেতু নির্মাণের পূর্বে, কুম্ভকর্ণের আক্রমণে বিচলিত হয়ে) দুর্গাপূজা করেছিলেন তখনই সফল হয়েছিলেন, তখনই তিনি সমুদ্রে সেতু নির্মাণ করতে সমর্থ হয়েছিলেন এবং রাবণকে সংহার করতে সক্ষম হয়েছিলেন। পরন্তু গোস্বামী তুলসীদাস মশাই লিখেছেন -

রাম কাম সত কোটি সুভগতন, দুর্গা কোটি অমিত অরি মর্দন।।
সারদ কোটি অমিত চতুরাঈ। বিধি সত কোটি সৃষ্টি নিপুনাঈ।।
বিষ্ণু কোটি সম পালন কর্তা। রুদ্র কোটি সত সম সংহর্তা।।

কোটি-কোটি ইন্দ্রের সমান বৈভব বিলাস, কোটি-কোটি বিষ্ণুর সমান পালন কর্তা, কোটি-কোটি শিবের সমান সংহারকর্তা, কোটি-কোটি ব্রহ্মার সমান সৃষ্টিকর্তা, কোটি কোটি দুর্গা সম শত্রু বিনাশক একমাত্র ভগবান, কোটি-কোটি দেবদেবীর সঙ্গে তাঁর তুলনা সেই রূপ যেরূপ কেউ শত-শত কোটি খদ্যোতকে সূর্যের সমকক্ষ বলে। এই উপপুরাণে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ভগবান রাম দুর্গাপূজা করতেন। পরমাত্মার অংশমাত্রে অসংখ্য সৃষ্টির সৃজন, পালন এবং সংহার হয়ে থাকে। সেই পরমাত্মা কোন্ দেবী দুর্গার পূজা করতেন? নবরাত্রিতে দেবী-প্রতিমা স্থাপনা করে দুর্গাপূজার প্রচার-প্রসার দ্বারা জন-সাধারণের মনে মর্যাদা পুরুষোত্তম ভগবান রামের আদর্শের প্রতি যে শ্রদ্ধাভাব তা মুছে তন্ত্র-মন্ত্র, ভূত-প্রেত, ডাকিনী-শাকিনী-হাকিনী-যোগিনী প্রভৃতি দ্বারা পূজিত দেবীর উপাসনা পদ্ধতি শিখিয়ে শিশুদের মধ্যে আপনি কোন্ সংস্কার-এর সূত্রপাত করতে যাচ্ছেন।'

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অবমাননা

দেবী পুরাণের লেখক ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে কালীর অবতার বলে তাঁর সফলতার কৃতিত্ব দেবীকে দিয়েছেন। এই পুরাণে উল্লিখিত আছে যে, পুতনা যখন কৃষ্ণকে বধ করার জন্য তাঁকে নিজের বক্ষে তুলেছিল তখন ভগবান কৃষ্ণ কালীরূপ ধারণ করেছিলেন এবং তাকে বধ করে পুনরায় বালকৃষ্ণরূপ ধারণ করেছিলেন। এই প্রকার তৃণাবর্ত যখন কৃষ্ণকে বাতাসের সাহায্যে শূন্যে তুলে ধরেছিল তখন কৃষ্ণ কালীরূপ ধারণ করেছিলেন। সেই সময় কালী বাঘম্বর ধারণ করেছিলেন। কালী খড়্গ দ্বারা অসুর সংহার করে পুনরায় শ্যাম সুন্দর রূপ ধারণ করেছিলেন। কংসকে বধ করার সময় কৃষ্ণ কালীরূপ ধারণ করে কংসের কেশগুচ্ছ ধরে তরোয়ালের সাহায্যে তার মুণ্ডচ্ছেদ করেছিলেন। এরপর কালী পুনরায় কৃষ্ণরূপ ধরেছিলেন এবং বলরামের সঙ্গে নৃত্য করতে শুরু করেছিলেন।

মহাভারত বিকৃত করার প্রয়াস

দেবীর মহিমা-মহিমা গায়ন করতে-করতে দেবী পুরাণের লেখক সাংস্কৃতিক গ্রন্থ মহাভারতও বিকৃত করার প্রয়াস করেছেন। এতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মহাভারতের যুদ্ধ প্রারম্ভ করার পূর্বে পাণ্ডবগণ রথ থেকে নেমে জয়লাভ করার জন্য জগদম্বার স্তুতি

করতে শুরু করেছিলেন। দেবী তাঁদের অভয়দান দিয়ে বলেছিলেন কৃষ্ণরূপে আমি আপনাদের সকলকে রক্ষা করব। পাণ্ডবগণ ভগবতীর স্তুতি গায়ন করেছিলেন এতে প্রসন্ন হয়ে দেবী বলেছিলেন যে, আমার কৃপাতে তোমরা হৃতরাজ্য ফিরে পাবে। অজ্ঞাতবাসকালে আত্মগোপনের স্থান না পেয়ে পঞ্চপাণ্ডব দেবীর স্তুতি করেছিলেন। দেবী তাঁদের মৎস্য দেশের রাজা বিরাটের নিকট বাস করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। সেখানে কীচকের ভয়ে ভীত হয়ে দ্রৌপদী দেবীর শরণাগত হয়েছিলেন এবং দেবীর কৃপার ফলস্বরূপ ভীমসেন কীচককে বধ করেছিলেন। নিজ ধাম গমনের সময় দ্রৌপদী দ্বারকাতে সমুদ্রের তীরে সকলের সম্মুখে নিমেষে কৃষ্ণের কালী বিগ্রহে বিলীন হয়ে গিয়েছিলেন। অর্জুন, ভীম ইত্যাদি পাণ্ডব মহাসাগরে দেহ ত্যাগ করে স্বর্গে গমন করেছিলেন (পরন্তু মহাভারতে এঁদের দেহত্যাগের স্থান হিমালয় উল্লেখ করা হয়েছে)। রুক্মিণী প্রভৃতি প্রধান রানীগণ শিবরূপ ধারণ করে উত্তমলোকে গমন করেছিলেন। কৃষ্ণের অন্যান্য ভার্যাগণ ভৈরবরূপে পরিবর্তিত হয়েছিলেন। এইরূপ পৃথিবীর ভার দূর করে জগন্মাতা দেবী নিজলোক গমন করেছিলেন। এই সমস্ত কাহিনীর সঙ্গে মহাভারতের কাহিনীর একরূপতা নেই। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, দেবীর উপাসকগণ দ্বারা সংস্কৃতি গ্রন্থ মহাভারতকে বিকৃত ভাবে প্রস্তুত করে জনসাধারণের মনে ভ্রম উৎপন্ন করা হয়েছে।

এই পুরাণে বর্ণিত আছে যে, যখন কৃষ্ণের পুত্র প্রদ্যুম্নকে শম্বরাসুর অপহরণ করেছিল তখন কৃষ্ণ অধীর হয়ে যোগমায়ার স্তব করেছিলেন এবং বলেছিলেন যে, পূর্বজন্মে নারায়ণরূপে বদ্রিকাশ্রমে আমি আপনার পূজা সম্পন্ন করেছিলাম, আপনি আমার সেই ভক্তি কেন বিস্মৃত হয়েছেন? আমি আপনাকে প্রসন্ন করার জন্য অম্বা-ব্রত এবং নবরাত্রি ব্রত পালন করব। যদি আমার পুত্র জীবিত তবে কৃপা করে তা আমাকে দেখিয়ে দিন। দেবী প্রকট হয়ে বলেছিলেন যে, শম্বরাসুর আপনার পুত্রকে হরণ করেছে। যখন সে ষোলো বছরের হবে তখন আমার কৃপাতে সে স্বয়ং শম্বরাসুরকে বধ করে আপনার নিকট ফিরে যাবে। এই প্রকার মহাভারতের কাহিনীগুলি বিভিন্ন স্থানে বিকৃত করে শুধু দেবীর প্রভাব বিস্তারের প্রয়াস করা হয়েছে।

বেদব্যাস এবং দেবী

এই প্রকার বলা হয় যে পুরাণ এবং উপ-পুরাণগুলি ব্যাসদেব দ্বারা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে পরন্তু মহাভারতের যুদ্ধের সময়ই ব্যাসদেব নিজের মাতা সত্যবতীকে নিয়ে তপস্যা করার জন্য চলে গিয়েছিলেন এবং লিখন কার্যে বিরাম দিয়েছিলেন। অভিমন্যু পুত্র পরীক্ষিত শাপগ্রস্ত হওয়ার পর তাঁকে ভাগবতের কাহিনী ব্যাসদেবের শিষ্য শুকদেব শুনিয়েছিলেন। পরীক্ষিত পুত্র জন্মেজয়-এর নাগ যজ্ঞে কথকতা করার পরম্পরাতে সূতজী নিযুক্ত হয়েছিলেন।

মহাভাগবতের দেবী পুরাণে উল্লিখিত আছে যে, আঠেরোটি পুরাণ লিপিবদ্ধ করার পরও ব্যাসদেব অশান্ত ছিলেন। তখন দেবীভক্ত বেদব্যাস হিমালয় গিয়ে কঠোর তপস্যা

করেছিলেন। ভগবতী তাঁকে দর্শন দিয়েছিলেন এবং ব্রহ্মলোক যেতে বলেছিলেন। ব্যাসদেব সমস্ত বেদশাস্ত্র দেবীর চরণ যুগলের নীচে দেখেছিলেন। সেখানেই মহাভাগবত দেবী পুরাণও প্রত্যক্ষ করেছিলেন। সেখান থেকে ব্যাসদেব পৃথিবীতে এসেছিলেন এবং তিনি মহাভাগবত দেবীপুরাণ রচনা করেছিলেন। এর থেকে এটাই মনে হয় যে, ব্যাসদেব এই শাস্ত্র লিপিবদ্ধ করেননি; পূর্ব হতেই ব্রহ্মলোকে লিখিত ছিল।

ভগবতী দুর্গার ব্যাসদেব স্তুতি করেছেন যে, ইনি কখনও দ্বিভুজ, কখনও চতুর্ভুজ, কখনও অষ্টভুজ, কখনও দশভুজ অষ্টাদশ ..... অনন্তভূজা যুক্ত। ইনি দিব্য দেহ ধারণ করেন। ইনি মূল প্রকৃতি জগদম্বা, দক্ষকন্যা সতী, হিমবন্তের কন্যা পার্বতী, বিষ্ণুর ভার্যা লক্ষ্মী এবং ব্রহ্মার ভার্যা সরস্বতী এইরূপ লেখক মহাশয় ঘুরে ফিরে ত্রিদেব এবং তিন দেবীর গুণকীর্তন করে গেছেন।

ব্যাসদেব দেবী ভক্ত ছিলেন না। তিনি সারা জীবন একমাত্র পরমাত্মার মহিমা কীর্তন করেছিলেন, বেদ তাঁরই দ্বারা লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল, শ্রীমদ্‌ভাগবত, গীতা, ব্রহ্মসূত্র তাঁরই কৃতিত্ব। এই সমস্ত গ্রন্থে তিনি একমাত্র পরমাত্মাকে পূজা করার নির্দেশ দিয়েছেন। এখন তিনি কিরূপে বলতে পারেন যে, না, না এতদিন পর্যন্ত আমি মিথ্যা বলছিলাম; প্রকৃতিই ঠিক, প্রকৃতিই দেবী। প্রকৃতির অতীত হওয়ার সাধনা সম্বন্ধে যিনি এতদিন বলে এসেছেন সেই ব্যাসদেব কবে থেকে দেবী অর্থাৎ মায়াভক্ত হয়ে গেলেন।

এখন আপনি সচ্চিয়ায় মাতার সন্দর্ভে জৈন মুনি দ্বারা দেবীকে প্রবোধদান করতে দেখেছেন (অর্থাৎ দেবীপূজা তখন থেকে শুরু হয়েছে যখন হিন্দু ধর্মে জৈন শাখার সৃষ্টি করা হয়েছে।) বস্তুতঃ আড়াই হাজার বছর ধরে ক্রমাগত গীতা শাস্ত্রের প্রচার প্রতিবদ্ধ ছিল, শিক্ষা প্রতিবদ্ধ ছিল। শিক্ষার অভাবে জনসাধারণ ধর্মের বিষয়ে অনভিজ্ঞ হয়ে গিয়েছিল; সেইজন্য যার মনে যা আসছিল, ধর্মের নাম করে, বেদব্যাসের নামে লিপিবদ্ধ করে এসেছে। বেদব্যাসের হাজার-হাজার বছর পর পুরাণ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে কিন্তু সব বেদব্যাস দ্বারা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে এই প্রকার বলা হয়। এযুগে তো 'ব্যাস' কথকতা করেন যাঁরা, তাঁদের একটি উপাধি হয়ে দাঁড়িয়েছে। অতএব কোন পুরাণ অথবা উপ-পুরাণে বেদব্যাসের নাম দেখে ভ্রমে পড়া উচিত নয়।

কল্পান্তরের কাহিনী

মহাভাগবত দেবীপুরাণে উল্লিখিত আছে যে, এই পুরাণে বর্ণিত ঘটনাগুলির অন্যান্য পুরাণের কাহিনীর সঙ্গে সাদৃশ্য নেই সেইজন্য এসব কল্প-কল্পান্তরের কাহিনী মনে করে এই কাহিনীগুলিকে অশ্রদ্ধা করা উচিত নয়। কল্প সম্বন্ধে বলা হয় যে, যখন প্রলয়কালে পৃথিবী জলমগ্ন হয়ে যায়, ব্রহ্মা, দেবতা, সূর্য, চন্দ্র সব রসাতলে যায় তখন কল্পের অন্ত হয়। এবং নতুন সৃষ্টিতে নতুন ব্রহ্মা নতুন দেব-দেবী এবং নতুন জীব উৎপন্ন হয়। এই কাহিনী যদি কল্পান্তরের এবং সেই কল্পে মানুষ, দেব-দেবী, ব্রহ্মা সকলেরই বিনাশ হয়েছে তবে কি দেবীর জলে নিমজ্জন হয়নি? ঐ কল্পের দেবীকে এই কল্পের

মানুষদের পূজা করতে কেন বাধ্য করা হচ্ছে? এই কল্পের চারটি যুগেরই ইতিহাস আমাদের হাতে রয়েছে, এতে এই দেবী অথবা তাঁর দ্বারা সম্পন্ন কার্যের কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না।

দেবীর পূজারী ত্রিগুণময়ী প্রকৃতির পূজা করছেন। দেবী পূজারী ভারতীয় ইতিহাস, পরম্পরা, সংস্কৃতি, ধর্ম, আস্থাকে তুচ্ছ জ্ঞান করা হয়েছে, আঘাত করা হয়েছে। এদের বলার অর্থ হচ্ছে যে, ভীম কীচককে বধ করেনি, দেবী বধ করেছিলেন। দ্রৌপদীর লজ্জা রক্ষা কৃষ্ণ নয়, দুর্গারূপ কৃষ্ণ রক্ষা করেছিলেন। পূতনাকে বধ কৃষ্ণ নয়, দেবী করেছিলেন। যশোদাকে বিশ্বরূপ দর্শন করিয়েছিলেন দেবী। শিব রাধার অবতার ছিলেন। এইরূপ যা কিছু ছিলেন, দেবী ছিলেন; ভগবানের অস্তিত্বই ছিল না। মর্যাদা পুরুষোত্তম রাম, ভগবান কৃষ্ণ, যা জ্যোতির্ময় পরমাত্মস্বরূপ, এঁদের সকলের অস্তিত্ব অস্বীকার করে এক দেবীর চরিত্র প্রচারিত করার এঁরা কুৎসিত প্রয়াস করেছেন। এঁরা ভারতের ইতিহাসই সমাপ্ত করে দিয়েছেন। এইপ্রকার রামের গল্প, কৃষ্ণের কাহিনী, মহাভারতের কাহিনী, পরমাত্মার কাহিনী একেশ্বরবাদ যা সর্বদা ছিল, আদিশাস্ত্র গীতার শ্লোকগুলি অযথার্থভাবে প্রস্তুত, বৈদিক সিদ্ধান্ত, উপনিষদগুলির সিদ্ধান্ত - এ সমস্ত তুচ্ছ জ্ঞান করে এ সমস্তের উপর শুধু এক দেবী ভাগবত অথবা দেবী পুরাণকে স্থান দেওয়া হয়েছে।

জীবন যাত্রার রীতি পরিবর্তিত করে বুদ্ধিজীবীগণ মন্দিরে মাতা পার্বতীর প্রতিমা স্থাপিত করে মাংস এবং মদিরা সেবনের পথ প্রশস্ত করেছেন। এগুলি সেবন যে যুক্তিসঙ্গত একথা প্রমাণিত করার জন্য তন্ত্রশাস্ত্র বিশেষের গোপনীয় রহস্য সম্বন্ধে জানিয়ে আগম গ্রন্থগুলির রচনা করা হয়েছে, শত-শত গোপনীয় তান্ত্রিক গ্রন্থের রচনা করা হয়েছে, যাতে দেবীর উপাসনার মন্ত্র, বিধি, কবচ, অর্গলা, কীলক, কুঞ্জিকা, কাদিবিদ্যা, হাদিবিদ্যা, শ্রী ইত্যাদি যন্ত্র এবং চক্রগুলির উল্লেখ করা হয়েছে। এদের গ্রন্থগুলি গোপনীয় কুলার্ণব তন্ত্রে উল্লিখিত আছে যে, যে-যে এই মতে দীক্ষিত নয় তাকে ধন, স্ত্রী, প্রাণ পর্যন্ত দিতে পারো কিন্তু এই গ্রন্থগুলি দেখিয়ো না। দেবী-উপাসক লাল চন্দনের ফোঁটা কেটে, লাল সিন্দুর, লাল রোলী (চুন ও হলুদের গুঁড়া) লাল শাড়ি, লাল উড়ানি, লাল জবা এবং খাওয়া এবং পান করার লাল বর্ণের যত পদার্থ রয়েছে, দেবীকে অর্পণ করেন; কিন্তু এদের গদি, সম্প্রদায় কোথাও দেখা যায় না। তন্ত্রে বামমার্গের সাধককে কৌল বলা হয়। কৌল মার্গে পাঁচ প্রকারের উপহার দেবীকে নিবেদন করে পূজা করা হয় -

মদ্যং মাংসং চ মীনং চ মুদ্রা মৈথুনমেব চ।
মকারং পঞ্চকং প্রাহুর্যোগিনাং মুক্তিদায়কঃ।।

অষ্টৈশ্বর্য পরম মোক্ষম্ মদ্যপানেন শৈলজে।
মাংসভক্ষণমাত্রেণ সাক্ষান্নারায়ণো ভবেৎ।।

মৈথুনেন মহাযোগী মম তুল্যো ন সংশয়ঃ।

বামমার্গী কৌলদের সাধনা রাত্রির ক্ষীণ প্রকাশে ভৈরবী চক্র তৈরী করে নীচ জাতির নগ্ন স্ত্রীলোকদের পূজা করা থেকে শুরু হয় -

চাণ্ডালী চর্মকারী চ মাতঙ্গী মৎস্যকারিণী।
মদ্যকর্মী চ রজকী চ ক্ষৌরকী ধনবল্লভা।
অষ্টৈতা কুলযোগিন্যা সর্বসিদ্ধি প্রদায়িকা।।

এই সমাজবিরোধী দলিত বিরোধী অশ্লীল আচরণ দেখে ভারতীয় জনসাধারণ কৌলমার্গ, বামমার্গ, বজ্রযান ইত্যাদি সাধনাগুলি বর্জন করেছিল। গোস্বামীজীও এগুলির নিন্দা করেছেন - '**কৌল কাম বস কৃপিন বিমূঢ়া।**' এজন্যই তিনি বলেছেন - '**তজি শ্রুতি পন্থ বাম পথ চলহীঁ।**'

একাক্ষরী মন্ত্রগুলির জাল এবং কীলকের ভ্রম

এই মন্ত্রগুলি নিরর্থক একাক্ষরী হয়, যেমন - এং, হ্রীং, ক্লীং, ক্রৌং ইত্যাদি। অভিচার অর্থাৎ মারণ, মোহন, বশীকরণ, উচ্চাটন, স্তম্ভন, বিদ্বেষণ - এর মত ক্রিয়ার জন্য মন্ত্র শেষে স্বাহা, বষট্, বৌষট্, হুম, ফট - শব্দগুলি প্রয়োগ করা হয়। বৌষট্ দ্বেষ উৎপন্ন করার জন্য, ফট্ শস্ত্র আঘাতে নিহত করার জন্য, হুম শত্রুদের স্থানচ্যুত করার জন্য, প্রাণ-হরণ করার জন্য বষট্ শব্দের প্রয়োগ করা হয়।

গীতাশাস্ত্রে ওম জপ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে - '**ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম।**' একাক্ষর মন্ত্র ওঁ দেখে দেবীপূজকগণ পূজাতে বিভিন্ন একাক্ষরী মন্ত্রের বিধান করেছেন। কোন্ সাধকের জন্য কোন মন্ত্র লাভদায়ক এটি নির্ণয় করার জন্য কুলাকল চক্র, রাশি-চক্র, ষড়্ চক্র, অকডম-চক্র ইত্যাদিগুলির উপর বিচার করে জিহ্বা শোধন করে মন্ত্র চৈতন্য করার বিধান সম্বন্ধে বলা হয়েছে এবং মূর্ধাতে সেই মন্ত্র ন্যাস করার নিয়ম।

এরা নিরর্থক একাক্ষী মন্ত্রের গোপনীয় অর্থও কল্পনা করে নিয়েছে; যেমন - সরস্বতী - বীজ 'এং' - এটিতে এ = সরস্বতী, বিন্দু (.) = দুঃখহরণ; এইপ্রকার এং অর্থাৎ দেবী সরস্বতী আমার দুঃখগুলি দূর করুন এই প্রকার শক্তিবীজ অথবা মায়াবীজ 'হ্রীং' এতে হ = শিব, র = শক্তি, ঈ = মহামায়া এবং বিন্দু (.) = দুঃখহরন; অর্থাৎ শিবযুক্ত শক্তি মহামায়া আমার দুঃখ নাশ করুন। এইপ্রকার কামবীজ অথবা কৃষ্ণবীজ 'ক্লীং' এতে ক = কৃষ্ণ অথবা কাম, ল = ইন্দ্র, ঈ = মহামায়া এবং বিন্দু (.) = দুঃখনাশ; অর্থাৎ মন্মথ-মথন কৃষ্ণ আমাকে সুখ প্রদান করুন। এই প্রকার কালীবীজ 'ক্রীং' এতে ক = কালী, র = ব্রহ্মা, ঈ = মহামায়া এবং বিন্দু (.) = দুঃখহরণ; অর্থাৎ ব্রহ্মস্বরূপিনী মহাকালী আমার দুঃখনাশ করুন। এই প্রকার 'দুং' অর্থাৎ দুর্গাবীজ এতে দ = দুর্গা, উ = রক্ষা এবং বিন্দু (.) = দুঃখনাশ; অর্থাৎ দুর্গে আমাকে রক্ষা কর, দুঃখ দূর কর। এই প্রকার 'হুঁ' কর্মবীজ অথবা কূর্চবীজ যাতে হ = শিব, উ = ভৈরব এবং বিন্দু (.) = দুঃখনাশ; অর্থাৎ ভয়ঙ্কর ভগবান শিব দুঃখ নাশ করুন। এই প্রকার ওঁ এর স্থানে বিভিন্ন একাক্ষরী মন্ত্রগুলির রচনা করা হয়েছে পরন্তু গীতাশাস্ত্রে শুধু ওঁ একাক্ষর মন্ত্র জপ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

প্রত্যেক অক্ষরের সঙ্গে অণুস্বার সংযুক্ত করে যেমন কং, খং, গং অথবা যং, রং, লং, বং প্রভৃতি অক্ষরগুলিকে অনুনাসিক (নাসিকার সাহায্যে উচ্চারিত) করে প্রত্যেক অক্ষরের নতুন অর্থ কল্পনা করে এরা একটি একাক্ষরী কোশ রচনা করেছে। (চীন এবং তিব্বতের লোকেরা নাসিকার সাহায্যে উচ্চারণ করে) এর ফলে মনে হয় যে, অভিচারমূলক দেবীপূজা চীন এবং তিব্বত থেকে ভারতে প্রচারিত করা হয়েছে। বলা হয় যে, বৌদ্ধ ভিক্ষু নাগার্জুন যে হুয়েন সাং-এর পরবর্তীকালে তারা দেবীর পূজা তিব্বত থেকে ভারতে এনে প্রচারিত করেছিল। এই তারা, দেবীর দশটি রূপ অথবা মহাবিদ্যার মধ্যে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে রয়েছে। তবেই স্পষ্ট হচ্ছে যে, দেবী পূজা বিদেশ থেকে আনীত, ভারতীয় নয় এবং সেইসঙ্গে আধুনিকও। এর কোন ইতিহাস নেই। এই কারণেই চীনের পর্যটক হুয়েন সাং প্রয়াগের ধর্ম সম্মেলনে শিব, বিষ্ণু, সূর্য, গণেশ, মহাবীর স্বামী এবং বুদ্ধের পূজার বর্ণনা তো করেছেন কিন্তু দেবীপূজা অথবা তন্ত্রসাধনার কোন বিবরণ তাঁর যাত্রা-বৃত্তান্তে নেই অর্থাৎ ৭০০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত দেবী পূজার কোন ইতিহাস ভারতে পাওয়া যায় না।

দেবীপূজকগণ একটি ভ্রান্ত ধারণা প্রচারিত করেছে যে, ভগবান শিব কলিযুগে সমস্ত মন্ত্রকে প্রভাবহীন করে দিয়েছেন। এখন যদি কোথাও শক্তি আছে তবে 'কলৌকালীবিনায়কৌ' - কলিযুগে কালী এবং গণেশ পূজাই মাত্র প্রভাবসম্পন্ন। এর জন্য একাক্ষর মন্ত্রগুলি প্রয়োগ করা উচিত যদ্যপি সদৈব ওম এবং রাম নাম জপ করার শাস্ত্র সম্মত বিধান দেখা যায় যে মন্ত্র দুটিকে দেবীপূজকগণ প্রভাববিহীন বলে প্রচারিত করেছে এবং এইরূপে আস্থার উপর, ভক্তির উপর কুঠারাঘাত করা হয়েছে।

এই গ্রন্থে উল্লিখিত আছে যে, বারাণসী ধামে ভগবান শিব দুর্গাতারক মন্ত্র প্রদান করেন (একথা বিচারযোগ্য যে কাশীর বারাণসী নামকরণ আধুনিককালে করা হয়েছে, এই নাম প্রাচীন নয়।) এখনও পর্যন্ত এই ধারণা প্রচলিত ছিল যে, কাশীতে ভগবান শিব রামমন্ত্র প্রদান করেন - **'কাসীঁ মরত জন্তু অবলোকী। জাসু নাম বল করউঁ বিসোকী।।'** শবযাত্রার সময় 'রাম নাম সত্য হ্যায়' বলা হয় এই পরম্পরাও রয়েছে, 'দুর্গা-দুর্গা' বলার নয়। কিন্তু এই পুরাণে উল্লিখিত আছে যে, ভগবান শিব সর্বদা দুর্গাকে স্মরণ করতে থাকেন পরন্তু মানসে উল্লিখিত আছে -

মঙ্গল ভবন অমঙ্গল হারী। উমা সহিত জেহিঁ জপত পুরারী।।

তুম্হ পুনি রাম রাম দিন রাতী। সাদর জপহুঁ অনঙ্গ আরাতী।।

সিব সম কো রঘুপতি ব্রত ধারী। বিনু অঘ তজী সতী অস নারী।।

এই প্রকার ভারতীয় সংস্কৃতিকে অবহেলা করে দেবী পূজার উৎসাহতে ভুল পরম্পরার নির্মাণ হচ্ছে।

বস্তুতঃ শক্তি এবং শক্তিমানের মধ্যে কোন ভেদ নেই। গোস্বামীজী বলেছেন -

গিরা অরথ জল বীচি সম কহিঅত ভিন্ন ন ভিন্ন।
বন্দউঁ সীতারাম পদ জিন্হহি পরম প্রিয় খিন্ন।। (মানস, ১/১৮)

লঙ্কার রাজসভাতে হনুমান রাবণকে বলেছিল -

সুনু রাবন ব্রহ্মাণ্ড নিকায়া। পাই জাসু বল বিরচতি মায়া। (মানস, ৫/২০/৪)

নিঃসন্দেহে মায়া ব্রহ্মাণ্ড-সমূহ রচনা করে, কিন্তু কার শক্তিতে? শক্তি তো পরমাত্মার, সেইজন্য পূজা সেই একমাত্র পরমাত্মার করা উচিৎ। গীতার অনুসারে দেবী মায়ার রূপ, প্রকৃতি, এরই অতীত হতে হবে, মায়া থেকে আত্মরক্ষা করতে হবে।

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে।। (গীতা, ৭/১৪)

অর্জুন! এই তিনগুণের সঙ্গে সংযুক্ত আমার অদ্ভুত মায়া দুস্তর; কিন্তু যে পুরুষ নিরন্তর আমারই ভজনা করেন, তারা এই মায়া উত্তীর্ণ হতে পারেন। এটা দৈবী মায়া, পরন্তু ধূপ-ধূনা দিয়ে এর পূজা আরম্ভ করে দেবেন না যেন। উত্তীর্ণ হতে হবে। এই বিষয়টি আরও স্পষ্ট করে ভগবান বলেছেন যে -

প্রকৃতিং পুরুষং চৈব বিদ্ধ্যনাদী উভাবপি।
বিকারাংশ্চ গুণাংশ্চৈব বিদ্ধি প্রকৃতি সম্ভবান্।। (গীতা, ১৩/১৯)

অর্জুন! এই প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়কেই অনাদি বলে জানবে এবং বিকারসমূহ ত্রিগুণ প্রকৃতি থেকেই উৎপন্ন বলে জানবে। বিকারের জন্য জীবাত্মা অধম যোনিতে জন্মগ্রহণ করে, তার পতন হয়, ঈশ্বর লাভ হয় না। এখানে প্রকৃতিকেই জনসাধারণ দেবী জ্ঞানে পূজা করছে। গীতাশাস্ত্রে তো শক্তি শব্দটি ব্যবহার পর্যন্ত করা হয়নি। পরমাত্মা প্রকৃতির অতীত, আপনার অন্তরে স্থিত। তাঁকে লাভ করার একমাত্র উপায় হল একমাত্র পরমাত্মার শরণাগতি -

প্রকৃতি পার প্রভু সব উরবাসী।
ব্রহ্ম নিরীহ বিরজ অবিনাসী।।

শরণাগত হওয়ার বিধি হল গীতাশাস্ত্র দ্বারা নির্ধারিত কর্ম-এর আচরণ। কর্ম করলে পরমাত্মাকে নিম্নলিখিত ক্রমে জানা যায় -

উপদ্রষ্টানুমন্তা চ ভর্তা ভোক্তা মহেশ্বরঃ।
পরমাত্মেতি চাপ্যুক্তো দেহে হস্মিন্ পুরুষঃ পরঃ।। (গীতা, ১৩/২২)

সেই পুরুষ **'উপদ্রষ্টা'** - হৃদয় দেশে অতি সমীপে, হাত-পা-মন যত সমীপে তার চেয়েও অধিক সমীপে দ্রষ্টা রূপে স্থিত। তার প্রকাশে আপনি ভাল করুন, মন্দ করুন, তাতে তাঁর কোন প্রয়োজন নেই। তিনি সাক্ষীরূপে স্থিত। সাধনাপথে সাধক যখন সাধনা করে নিজের স্তর কিছুটা উন্নত করেন, তাঁর দিকে এগিয়ে যান, তখন দ্রষ্টা পুরুষের ক্রম পরিবর্তন হয়। তিনি **'অনুমন্তা'** অনুমতি প্রদান করতে শুরু করেন, অনুভব জাগিয়ে তোলেন। সাধনা দ্বারা আরও নিকটে এগিয়ে ঘনিষ্ঠ হলে সেই পুরুষ **'ভর্তা'** রূপে ভরণ পোষণ করেন এবং সাধকের যোগক্ষেমেরও দায়িত্ব গ্রহণ করেন। সাধনা আরও সূক্ষ্ম

হলে তিনিই '**ভোক্তা**' হন। '**ভোক্তারং যজ্ঞ তপসাম্**' - যজ্ঞ, তপস্যা যা কিছু সম্ভব হয়, সমস্তই সেই পুরুষ গ্রহণ করেন এবং যখন গ্রহণ করে নেন, তখন তার পরের অবস্থাতে '**মহেশ্বরঃ**' - মহান্ ঈশ্বররূপে পরিণত হন। তিনি প্রকৃতির স্বামীরূপে প্রতিষ্ঠিত হন, কিন্তু এখনও প্রকৃতি জীবিত তবেই তার স্বামী তিনি। এর থেকেও উন্নত অবস্থাতে সেই পুরুষ '**পরমাত্মেতি চাপ্যুক্তো**' - যখন পরমের সঙ্গে সংযুক্ত হন, তখন তাঁকে **পরমাত্মা** বলা হয়। এইরূপ এই দেহে স্থিত হয়েও এই পুরুষ আত্মা '**পরঃ**' এই প্রকৃতির অতীত। পার্থক্য এই যে শুরুতে দ্রষ্টারূপে ছিলেন, ক্রমশঃ উত্থান হতে হতে পরম-এর স্পর্শ করে সাধকও পরমাত্মারূপে পরিণত হন।

এই কুরীতিগুলি থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য, ধর্মের সঠিক ব্যাখ্যা জানার জন্য আপনি গীতার ভাষ্য 'যথার্থ গীতা' অধ্যয়ন এবং মনন করুন যাতে ভবিষ্যতে ভ্রম উৎপন্ন না হয়।

।। বলুন শ্রীসদ্গুরুদেব ভগবানের জয় ।।

আমাদের প্রকাশনা

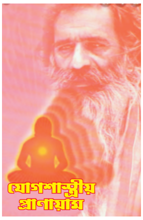

যোগশাস্ত্রীয় প্রাণায়াম -

যোগশাস্ত্রীয় প্রাণায়ামে মহারাজ বলেছেন যে, যম, নিয়ম এবং আসন দৃঢ় হলেই নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস শান্ত প্রবাহিত হয়। একেই প্রাণায়াম বলে। পৃথক করে প্রাণায়াম নামের কোন ক্রিয়া নেই। এই যোগ চিন্তনের অবস্থা বিশেষ। এরই সমাধান এই পুস্তিকাতে করা হয়েছে।

৩টি ভাষাতে

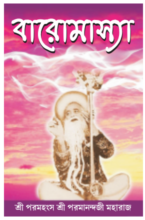

বারোমাস্যা -

মহারাজ নিজের পূজ্য গুরু শ্রীপরমানন্দজী মহারাজজীর আকাশবাণী দ্বারা প্রাপ্ত ভজন (ঈশ্বরীয় গায়ন) বারো মাস্যার সঙ্কলন এবং এর ব্যাখ্যা করেছেন। এতে প্রবেশিকা থেকে পরাকাষ্ঠা পর্যন্ত লক্ষ্য অভিমুখে অগ্রসর হওয়ার জন্য পথপ্রদর্শন করা হয়েছে।

হিন্দী ভাষাতে

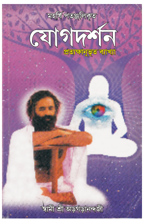

যোগদর্শন -

প্রত্যক্ষানুভূত ব্যাখ্যা -

মহর্ষি পতঞ্জলিকৃত এই পুস্তককে বলা হয়েছে যে, 'যোগ' প্রত্যক্ষ দর্শন এ সম্বন্ধে লিপিবদ্ধ করা অথবা বাচন সম্ভব নয়। সাধক সাধনাপথে চলেই উপলব্ধি করেন যে, মহর্ষি যা কিছু লিপিবদ্ধ করেছেন এর বাস্তবিক আশয় কি? এই পুস্তিকা সাধনোপযোগী।

৪টি ভাষাতে

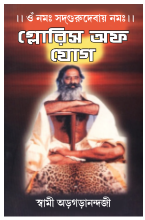

গ্লোরিস অফ যোগ -

হঠ, চক্র, ভেদন এবং যোগ, প্রাণায়াম, ধ্যানের বিষয়ে পূর্ণ পরিচয়।

ইংরাজী ভাষাতে

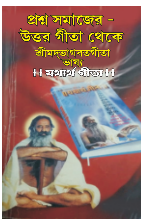

প্রশ্ন সমাজের -

উত্তর গীতা থেকে -

এই পুস্তিকাতে সামাজিক, আধ্যাত্মিক এবং ধার্মিক যেমনই প্রশ্ন হোক, সেসব গীতার আলোকে সমাধান করা হয়েছে।

হিন্দী ভাষাতে

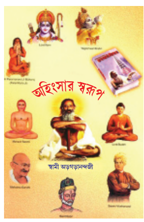

অহিংসার স্বরূপ -

অহিংসা বিচার্য বিষয়। মূলতঃ এটি যৌগিক, আন্তরিক সাধনার শব্দ। এই পুস্তিকাতে আমরা অধ্যয়ন করব যে, আমাদের পূর্বপুরুষগণ অহিংসা বিষয়টিকে কোন সন্দর্ভে নিয়েছেন।

৪টি ভাষাতে

বাল গীতা -

এই পুস্তিকা বালকের নির্মল মনে একমাত্র পরমাত্মার প্রতি পূর্ণ আকর্ষণ উৎপন্ন করে সমাজ এবং সাধনার পথে সহজ প্রবেশের জন্য কার্যকর। এই পুস্তিকাতে সমর্পণের পাঠ্যক্রম অঙ্কিত আছে এর ফলে শিশুদের মধ্যে ধর্ম-সন্দেশ-এর বীজারোপণ, সংস্কার সৃষ্টি হবে। তারা এই পথে চলবে এবং নিজের ভগবৎরূপ লাভ করবে।

৩টি ভাষাতে

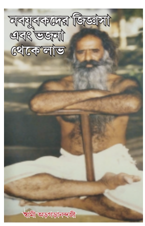

ভজনা থেকে লাভ (নবযুবকদের জিজ্ঞাসা) -

এই পুস্তিকাতে নবযুবকদের বহু প্রশ্নের সংক্ষেপে সমাধান করে ভজনার অনিবার্যতার উপর আলোকপাত করা হয়েছে। যদি একমাত্র পরমাত্মাতে মনকে স্থির করতে সক্ষম হন তবে সেই প্রভুর সংরক্ষণে সাধনা চলতে থাকবে, জাগতিক কাজেও সহযোগিতা লাভ হবে এবং গমনাগমন থেকে মুক্তিলাভ তো হবেই কারণ ঈশ্বর পথে আরম্ভের নাশ হয় না।

হিন্দী ভাষাতে

MP3 অডিও সিডিজ্

১১টি ভাষাতে

শ্রী স্বামীজীর মুখারবিন্দ থেকে নিঃসৃত
অমৃতবাণীর সঙ্কলন ভল্যুম ১ থেকে ৫০ পর্যন্ত

হিন্দী ভাষাতে

সকলের ধর্ম এক ঃ ধর্ম পরিবর্তন হয়ই না

গীতাতে অর্জুনের প্রমুখ প্রশ্ন ধর্ম ছিল। সে জাতি ধর্ম এবং কুলধর্মই সনাতন বলে ভাবত। তার এই ভাবধারাকে ভগবান অজ্ঞান বলেছিলেন, তিনি বলেছিলেন এইরূপ ভাব কীর্তিদায়ক নয় এবং কল্যাণকরও নয়। তিনি বলেছিলেন যে, আত্মাই সনাতন, আত্মার বিশেষত্ব বলেছিলেন যে, আত্মা অচিন্ত্য-যতক্ষণ চিত্ত এবং চিত্তে সঙ্কল্পের তরঙ্গ বিদ্যমান ততক্ষণ এই আত্মাকে দর্শন এতে প্রবেশ এবং স্থিতিলাভ সম্ভব নয়। এই প্রসঙ্গে অর্জুন বলেছিলেন ভগবান এই মনকে বশে করা আমি বায়ুর ন্যায় অতি দুষ্কর মনে করি। একে বশ করা অতি কঠিন। ভগবান বলেছিলেন একে বশ করা কঠিন অবশ্যই; কিন্তু নির্ধারিত কর্ম নিরন্তর করা এবং দেখা শুনা বিষয়-বস্তু থেকে রাগ অর্থাৎ আসক্তির ত্যাগ বৈরাগ্য। অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা মনকে বশ করা যায়।

(গীতা ৬-৩৫)

অর্জুন জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, যোগ করতে করতে যদি কোন ব্যক্তির মন যোগচ্যুত হয় তবে সেই মোহিত ব্যক্তি নষ্ট-ভ্রষ্ট হয়ে যান কি? ভগবান বলেছিলেন যে, এই গীতোক্ত নির্ধারিত কর্ম করেন যিনি, তাঁর কখনও দুর্গতি হয় না পরন্তু যে বাসনাগুলির জন্য তাঁর মন বিচলিত হয়েছিল, সেগুলিকে ভোগ করে তিনি সদাচারসম্পন্ন শ্রীমান্ পুরুষের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। সেখানে পূর্বজন্মে যে সাধন করেছিলেন সেই বুদ্ধির সংযোগকে অনায়াসে লাভ করেন এবং প্রত্যেক জন্মে অভ্যাসে প্রবৃত্ত থেকে সেখানেই পৌঁছান, যাকে পরমগতি বলা হয়। (যথার্থ গীতা ৬/৪৫)

নির্ধারিত কর্মের অল্প আচরণও যদি করা হয় তবে প্রকৃতির মধ্যে সেই ক্ষমতা নেই যে, সেই কর্ম নাশ করতে পারে। বিপরীত ফলরূপ দোষও এতে হয় না যে, আপনাকে স্বর্গ, ঋদ্ধি ও সিদ্ধি পর্যন্ত পৌঁছিয়ে ছেড়ে দেবে। আপনি এই সাধনা শুরু করে যদি তা ছেড়েও দেন, গীতোক্ত এই সাধন আপনাকে উদ্ধার করেই ছাড়বে। (যথার্থ গীতা ২/৪০) যখন প্রত্যেক জন্মে আপনি সেই গীতোক্ত সাধনা করছেন তবে ধর্ম কিরূপে পরিবর্তন হবে? ধর্ম পরিবর্তন কখনও হয় না। মন এবং ইন্দ্রিয়গুলি রুদ্ধ করার সাধন বিশ্বের সকল মানুষের জন্য একরকম, এরই উল্লেখ গীতাতে করা হয়েছে। আপনারা সকলে এর আচরণ করতে পারেন। বিশেষ ভাবে জানার জন্য অধ্যয়ন করুন "যথার্থ গীতা"।

আপনি আমাদের ওয়েবসাইট থেকে এটি ফ্রী ডাউনলোড করতে পারেন ঃ-

(www.yatharthgeeta.com)

শ্রী পরমহংস স্বামী অড়গড়ানন্দ জী আশ্রম ট্রাস্ট

ন্যু অপোলো ইস্টেট, গালা নং - ৫, মোগরা লেন (রেলওয়ে সাবওয়ের নিকট)
অন্ধেরী (পূর্ব), মুম্বাই - ৪০০০৬৯, ভারত
দূরভাষ ঃ ০২২-২৮২৫৫৩০০

ই-মেল - **contact@yatharthgeeta.com** • ওয়েবসাইট - **www.yatharthgeeta.com**